বারিঝরা বাদলে

অনুরূপা দেবী

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীসুখেন গুপ্ত

মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায়
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ৩৭।বি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীপ্রদোষকুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন

'বিচারপতি' ও 'বারিঝরা বাদলে'র পাণ্ডুলিপি স্বর্গগতা লেখিকা তাঁহার তিরোধানের মাস-কয়েক পূর্বেই আমাদের হাতে দিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান বইটি তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। 'বিচারপতি' তিনি দেখিয়া গিয়াছেন—এটিও তাঁহার হাতে দিতে পারিলে. ধন্য হইতাম কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। আমরা জানি জীবিত থাকিতে যেমন জননীসুলভ স্নেহে তিনি আমাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেন, পরলোক হইতে তাঁহার আত্মাও তেমনি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সহজেই ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বারিঝরা বাদলে

বারিঝরা বাদলে

যেমন নামিতে হয়, তেমনি নামিয়াছে। যেমন প্রথম শ্রাবণে বৃষ্টি হয় নাই হারই শোধ তুলিবার চেষ্টায় আছে! এই প্রবল বৃষ্টিধারা যদি কোথাও গিয়া । সলিলাপ্লুত নদীর বাঁধ না ভাঙ্গে, পাহাড়ের আকস্মিক ঢল নামা জলে নদ-নদী, া-বিলের সমস্ত ভরা আধাব উপচাইয়া গিয়া বন্যা না আনে, তবে চাষার পক্ষে অ শার বাণী এ বহন করিতেছিল।

আকাশের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত জলভারবাহী সাদাটে ধূসর মেঘ! োনখান দিয়া আকাশেব আসল রং দেখা যায় না। থাকিয়া থাকিয়া কখনও মৃদু েগে কখনও প্রবলধারায় জল ঝরিতেছে তো ঝরিতেছেই। সারাদিনের মধ্যে এক-ারের জন্য সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, রাত্রে চাঁদের রূপ চোখে পড়িবে রও কোন লক্ষণ নাই। একটা হিন্দি প্রবচন হয়ত কাহারও কাহারও মনে ড়িছিল,—"বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর বহুৎ ভালানা ধূপ। বহুৎ ভালানা বোল্না চ ল্না বহুৎ ভালানা চুপ।"

তা হয়ত সত্যিই ভাল নয়। সুমিত্রা যেদিন হইতে এ বাড়িতে আসিয়াছে, না জের স্বপক্ষে না পরের বিপক্ষে কোন কথাই সে কহে নাই। নেহাৎ গোবেচারা াকে বলা হয় সে জাতির মেয়েও অথচ সে নয়, লেখাপড়া শিখিয়াছে। এই বাড়ির কর্ত্তার পায়ে পক্ষাঘাত এবং চোখেও অল্প অল্প ছানি পড়িয়াছে বলিয়া নিজে া হাঁটাও যেমন করিতে পারেন না, পড়াশোনাতেও তেমনি অপারগ। একটি-ত্র ছেলে বহু পূর্ব্বেই গত হইয়াছে, ভাইপো ও ভাগিনা দুজন আছে বটে, তারা নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। সুমিত্রাই তাঁকে ইংরেজী-বাংলা চিঠি-পত্রের জবাব লিখিয়া

দেয়, টেলিগ্রাম করার দরকার হইলে করে, কখনও কখনও তাঁর শখ হ'লে ভগবদ্
গীতা বা উপনিষদের কোন অংশ অথবা মেঘদূত বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় কিম্বা পঞ্চম
সর্গের মদনভস্ম বা উমার তপস্যা মূল সংস্কৃত হইতেই পড়িয়া শুনায়।

শরীরে অসুখ লাগিয়াই আছে। আজ এটা, কাল সেটা, কিছু না কিছু, একটা
যায় তো আর একটা আসে, জরাগ্রস্তের যেমন হয়। সুমিত্রাই তাঁকে সেবা করে।
এজন্য চাকর নবীন দিদিমণির উপর কি রকম যে কৃতজ্ঞ, সেই জানে। সারাদিন
সে এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতেও রাজী আছে, কিন্তু রাত-জাগা ...
প্রয়োজনের দিনে তাকে ছুটি দেয়।

লোকে কিন্তু এতটা পছন্দ করে না। কথাই আছে, 'যা' রয়-সয় ...
কর্ত্তা তো সুমিত্রার হাতের মুঠায়। আবার গৃহিণী? বহু স্থলে দেখা যায় ...
সুয়ো হইলে,—পুরুষই হোক,—আর মেয়েই হোক, অন্য জনের কাছে ...
যায়, এমন কি কোন কোন ঠাকুরমা-দিদিমা মা-বাবা পর্য্যন্ত অনুরূপ প...
গ্রস্ত হইয়া থাকেন। বাপের আদুরে ছেলে মাকে মানে না, আবার ম...
ঐ একই ব্যাপার ঘটে, অথচ কোথাকার কোন্ পাঁচ পরের মেয়ে অ...
মায়া-মন্ত্রে একই সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুইটিকে বশীভূত করিয়া লইল? কি ...
আসিয়াছে, তাহারই সন্ধান কে জানে? একটা কিছু ভিতরে আছে, ন...
পেটের ছেলে-মেয়েতে যা না পারে, ঐ শোণিত-সম্পর্কহীনা তরুণী ...
করিয়া? আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের মনের খবর জানিবার কি ...
আছে নাকি? পেটের মধ্যে ডুবুরী নামাইয়া দিলেও পেটের কথা বা...
না।

কৈলাসবাসিনী বয়সে অনেক সাধু-সজ্জন ও দেবারাধনা করি...
দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু সে মুখ দেখার সুখ তাঁর অদৃষ্টে সয় নাই। ...পুত্র
মানবক মা-বাপের এত আদর-ঐশ্বর্য্য বারটি বৎসরের বেশি ভোগ ক...

না। জ্যেঠা আপসোস করিয়া বলিল, "ভোগ করবার ভাগ্য নিয়ে তো আসা চাই।"

সত্যি কথা। ভাগ্য একটা মস্ত বড় জিনিস, তাকে না মানিলে চলে না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটাইবার, আপসোস ভুলিবার, সান্ত্বনা লাভ করিবার, নিরুপায় মানুষের জন্য ওই একটিমাত্র পথই তো শুধু খোলা আছে। শোকের প্রথম ধাক্কা কাটিলে কৈলাসবাসিনী মাতৃহীন দেবরপুত্র অমলাংশুকে মামা বাড়ি হইতে আনাইয়া লইয়া শূন্য গৃহে ও শূন্যতর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। ভবিষ্যতের আশা-ভরসা দিদিমা দ্বিধা না করিয়াই সমুদয় সত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাকে জ্যেঠাইমার প্রসারিত বাহুতটে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু হায়, ইহার মধ্যেই যে তার পাখা বাহির হইয়া গিয়াছে, বাঁধা থাকিবার মত অবস্থা ইতিমধ্যেই সে পার হইয়াছিল। বয়স বেশি নয়, কৈলাসবাসিনীর ছেলে বৈদ্যনাথপ্রসাদের চাইতে মাত্র তিন বৎসরের বড়। হইলে কি হয়, সে ছিল এক ধরনের ছেলে, এ আর। আসল কথা, এ তো মায়ের ছেলে নয়,—এ পরগাছা।

অল্পদিনের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বংশের শেষ সন্তান মানুষ করিবার জন্য তাঁরা ত্রুটি করিলেন না। কুড়ি বৎসর বয়সে কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সে কলিকাতায় গার্জেন-টিউটার ইত্যাদি সমভিব্যাহারে আই. এ. পড়িতে গেল। সেখানে গিয়া সে যেখানে পড়িল, তাহাতে ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে উঠিতে তো পারিলই না বরঞ্চ নামিয়াই পড়িল। সাত বৎসরের অধ্যবসায়ের পর কলেজের নাম কাটাইয়া আপাততঃ সে "বিজনেস্" করিতেছে। কিসের! সেকথা সে অবশ্য প্রতি হাত টাকা লইবার সময় ভাল ভাবেই বুঝাইয়া দেয়, কিন্তু আসলে কিছুই বুঝা যায় না। প্রাইভেট-টিউটার এখন বিজনেসের ম্যানেজার, তার বুঝাইবার পদ্ধতি ওর সঙ্গে এক নয়, তবে আসল বিষয়ে দুজনকার মধ্যেই একটা ঐকমত্য দেখা যায়, আসল ব্যাপার জটিল হইয়াই থাকে।

স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস মোচন করেন,—টাকা দেওয়া উচিত নয় জানিয়াও "বিজনেস্" বন্ধ করিতে আদেশ না দিয়া টাকাও দেন,—কি করিবেন তাঁরা টাকা লইয়া? সবই তো একদিন উহারই হইবে।

ভাগিনা অসীম এ-জাতের নয়, একটু আত্ম-বিশ্বাসী, একজেদী হইলে ... এ. পাশ করিয়াছে। তারও বাপ-মা নাই, বাপের অবস্থা তেমন ভা[illegible] তবে মনে তেজ ছিল। ছেলের পড়ার জন্য মামার সাহায্য কোনদিন [illegible] বলিয়াছিলেন, "তা যদি নিতে দিই, ছেলে আমায় মানবে না।"

ছুটির সময় অসীম অমলের সঙ্গে মামার বাড়ি আসে। অমলের [illegible] তিন চার বৎসরের ছোট, কিন্তু স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারায় অসংযম শীর্ণ ক্ষয়গ্রস্ত [illegible] চাইতে দু'তিন বৎসরের বড় দেখায়। কৈলাসবাসিনী মনে মনে তা[illegible] সমধিক স্নেহ করেন, কিন্তু অমলাংশু—মরিলে সেই তো তাঁদের পিণ্ড দি[illegible] বংশধর তো সেই।

এমন সময় কোন এক অভাবনীয় ঘটনায় পড়িয়া নিরাশ্রয়া সুমি[illegible] ব্যবস্থা হইল। সে আপনি আসে নাই, সংবাদ পাইয়া কৈলাসবাসিনী [illegible] আনাইয়া ছিলেন। সেই হইতেই সে তাঁদের বাটীতেই রহিয়া গিয়া[illegible] তিনকুলে কেহ আছে বা না আছে, জানা নাই। সুমিত্রা অন্ততঃ জানে [illegible] এও কি কখন সম্ভব? এমন হতভাগা নরকুলে কেহ জন্মায় যে সত্যই তিনকুলে তার একটি প্রাণীও থাকে না!

—হ্যাঁ বর্ষা নামিয়াছিল, দারুণ বর্ষা, একতলার ঘরের দেওয়ালে ছাতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, ভিজা কাপড়ের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে অস্বস্তি জন্মিতেছে, ভাঁড়ার ঘরে [illegible] পত্রে ঘুণের বাসা বাঁধিতেছে, পুরনো বাড়ীর এখান সেখান দিয়ে জল প[illegible] অশ্বস্তি আর কি! মনে হয় আর ধান চালের দরকার নাই, মানুষ পেটে না খাইয়াও ভদ্রভাবে চলাফেরা করুক, ধোপাবাড়ীর ফরসা কাপড় পরিয়া বাঁচুক।

সুমিত্রা তার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া মৃদু গুঞ্জনে বহুবার গীত একটা গান গাহিতেছিল, গাওয়া ঠিক নয় যেন আবৃত্তি করিতেছিল—

এই বারিঝরা বাদলে—
কত কথা পড়ে মনে গুরু মেঘ মাদলে।
বিজলী চমকি চায়, হা-হা রবে ডাকে বায়,
বিরহী ডাহুক-বধূ কাঁদে আজি উভরায়,
আঁখিজলে ভরে আঁখি, ধরে বাখি কি ছলে?
দিশি দিশি ঘনঘোর, আঁধার এ গৃহ মোর
শূন্য পরাণ মনে প্রবোধিব কি বলে!

মেঘ ডাকিয়া উঠিল, গুম্ গুম্ গুম্—মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল।

মেঘে ভরা আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেল। নীল আকাশকে কালো মেঘের রাশি যেমন নিবির করিয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, তেমনি করিয়া তার প্রাণপণে ঠেলিয়া-রাখা-স্মৃতির মেঘ মনটাকে ছাইয়া ফেলিল। শ্বাসরুদ্ধকর সেই চির অ-বিস্মৃত অশনি-গর্ভ মেঘের আবেষ্টনে মুহূর্ত্তকাল প্রাণটা তার একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, পবক্ষণেই কিন্তু যে অসীমধৈর্য্য সহকারে একান্তরূপে ভাঙ্গিয়া পড়া হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখিয়া মনুষ্যত্বের দৃঢ় ভিত্তিতে আপনাকে আজও প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, তাহারই প্রসাদে আত্মরক্ষা করিল। তা না পারিলে আজ এই ঘরখানাও কি তাব ঐ বিপুল বাষ্প সঞ্চিত অশ্রু-সলিলে ভাসিয়া যাইতে পারিত না?

সে'ও এই রকমেরই একটা অশ্রুভরা বাদল ঝরা সন্ধ্যা। সে আকাশও মাথার উপর এই রকম জলভার বহিয়া থমথম করিতেছিল, বৃষ্টির ধারা সরু ফোঁটায় অবিরল-ভাবে ঝরিয়াই চলিয়াছিল, বাগানের নালায় সে জল কলস্রোতে প্রবাহিত, ছাদের

নলগুলায় প্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। তার নিজ হস্তের পরিচর্য্যায় পরিপুষ্ট ফুলের গাছগুলি অকরুণ ধারাপাতের এবং ততোধিক ক্রুর পবনের নিষ্ঠুরতায় মাটির টবের উপর ক্রন্দনমুখতায় লুটাইয়া পড়িতেছিল, পুষ্পপ্রসবিনী লতাগুলি আশ্রয়বিরহিতা ভূমিলুণ্ঠিতা। করুণা-কাতর দৃষ্টিতে সে তখন তাদেরই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া গভীর বেদনা বোধ করিতেছিল। ফুটন্ত যুঁই, মালতী, বেল্লা, মল্লিকা ঝাঁটি চামেলীতে উদ্যান-ভূমি শ্বেত-শুভ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। আজও ঠিক সেই রকমেরই পুনরভিনয় চলিতেছে।

একটা বড় ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেটা একটা বহু পুষ্পিত চাঁপাফুলের গাছ, অজস্র চম্পক-গন্ধ এতদূরেও ভাসিয়া আসিতেছে। সুমিত্রা সেদিক হইতে তার ব্যথাহত দৃষ্টি জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল, সেও যে ঐ ভাবেই তার আশ্রয়বৃক্ষ হইতে ছিন্ন হইয়াছে!

সেই ঝঞ্ঝা বিতাড়িত বৃষ্টি-বজ্রাহত কাল-সন্ধ্যায় তার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে, যে ক্ষতির ক্ষত এ জীবনে পূরণ হইবে না! তার মনে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল,—বায়স্কোপের পর্দ্দায় যেমন একের পর এক ফুটিয়া ওঠে।

এত বড় বাড়ী নয়, কিন্তু সে ছিল নিজেদের বাড়ী। নিঃসম্পর্কিতা মাতৃ-সখীর অপরিমিত দয়ার দানে আজ তার ক্ষীণ দেহ সমধিক পুষ্টি হয়ত লাভ করিয়াছে। তার মধ্যে চর্ম্ম-চাকচিক্য বা বর্ণ-সমুজ্জ্বলতার সুযোগ যতই থাক, তার মধ্যের প্রতি রক্ত কণিকাটী সৃষ্টি হইয়াছে অপরের দাক্ষিণ্যে, এতটুকু কোন দাবীর দাওয়ায় নয়। দাতা প্রাণ খুলিয়াই দিতেছেন, গ্রহিতার দণ্ড-পল-নিমেষটুকু পর্য্যন্ত সেই অনধিকারের অধিকার লাভের মূল্যে বিক্রীত পরস্ব হইয়া যাইতেছে।

সেদিন তা ছিল না। সে ছিল তাদের রমনীয় সুখনীড়। ছোট্ট লাল ইটের বাংলোবাড়ী. পিতা-পুত্রীর সমবেত যত্নে সৃষ্ট ছোট্ট একটি ফুলবাগান। ক্ষুদ্র সংসারের সকল দায়িত্ব ছিল সুশিক্ষিতার স্নেহশীলা তারই মায়ের হাতে। তারা

পিতা-পুত্রীতে পড়াশুনা, ছবি আঁকা, বাগানকরা, ফটোগ্রাফী, ডাকটিকিট সংগ্রহ এই রকমেরই আরও কতকগুলি সংসারের পক্ষে একান্ত অপ্রোয়জনীয় প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া থাকিত। স্নানাহারের সময় মত সময় তাদের প্রায় মিলিত-না। নেহাৎ বাড়াবাড়ি দেখিলে কুরঙ্গিনী আসিয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "আচ্ছা, চান করে দুটো খেয়ে নিয়ে আমায় উদ্ধার করে দিয়ে কি এসব করা যায় না? ওরা কি ঘোড়া যে ছুটে পালিয়ে যাবে? নাও, উঠে পড়ো।"

শান্ত-স্বভাব অনুত্তেজিত প্রকৃতির স্বামী যথাপূর্ব নিজ কার্য্যে নিরত থাকিয়াই স্ত্রীকে শুনাইয়া অথচ ঈষৎ অনুচ্চস্বরের ভান দেখাইয়া কন্যাকে বলিতেন, "ওরে সিতু, শিগ্‌গির উঠে পড়, ম্যাডাম্ কুরি বড্ড রেগেছেন!"

কুরঙ্গিনীর কৃত্রিম কোপ ভাসিয়া যাইত, ক্ষীণ ওষ্ঠে হাসি চাপিতে চাপিতে হাসিয়া ফেলিতেন; বলিতেন, "তুমি না উঠলে ও উঠে করবে কি? দাঁড়াও না কাল থেকে রেঁধেবেড়ে পান্তাভাত করে রেখে দিয়ে শুয়ে শুয়ে ঘুমোব। খেও তাই।"

"ম্যাডাম! জানত নিজেই আমার মাথাটি খেয়ে রেখেছ। ঠাণ্ডা ভাতের আস্বাদই ভুলিয়ে দিয়েছ,—এখন ওরকম বীভৎস শাসন করতে গেলে যে স্বামী-হত্যার পাতকগ্রস্ত হবে।"

উঃ কি সাংঘাতিক শব্দই মানুষের মুখ দিয়া তার একান্ত অজ্ঞাতেও বাহির হইয়া যায়!

কুরঙ্গিনী ইহার পর সত্যই রাগত হইয়া কন্যার দিকে ফেরেন, "যা' ভাল বোঝ করো,—আমি আর তোমাদের ডাকতে আসবো না।" সুমিত্রার দুচোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, প্রফেসর নীরেন্দ্রনাথ কি ভীষণ অপ্রতিভ অনুনয়ে স্ত্রীর হাত ধরিলেন, কণ্ঠেই বা কি তাঁর অনুশোচনা!

"না না, ছি ছি, ভাল বলিনি, রাগ করো না কুরু! জানইত আমি মুখ আল্‌গা মানুষ, আমায় মাপ করো, লক্ষীটি।"

দাম্পত্য মিলনের সে ছবি, সে বয়স্থা মেয়ে কত সময়েই পিছন ফিরিয়া থাকিয়া চোখ না তুলিয়া পরিহার করিয়া গিয়াছে। তার বাপ-মা ছিলেন, ঠিক যেন দুইটি সমবয়সী বন্ধু—পিঠোপিঠি দুটি ভাইবোন। দ্বন্দ্ব-মিলন তাঁদের মধ্যে প্রহরে প্রহরে লীলা-বিস্তার করিত। সত্যকার কলহ কোন দিনই সে তাঁদের মধ্যে ঘটিতে দেখে নাই। আর ঐ যে ছবি আঁকা প্রভৃতি সেও তো ঐ কুরঙ্গিনীরই দান। স্কুলে সে নিজে শিখিয়া বেশ একটু উন্নতি করে এবং স্বামী-কন্যাকেও তার সাগ্রহ অংশ গ্রহণ করায়। এ বিষয়ে মেয়েকে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে দেখিলে বিরক্তও যে সে না হয় তা নয়।

সুমিত্রা তাদের একই সন্তান সেই হইয়াছিল একটু মুস্কিল। মায়ের ইচ্ছা মেয়েকে নিজের কাছে পাইয়া তাকে মনের মত সাংসারিকতা শিক্ষা দেন, বাপের তাতে অনিচ্ছা না থাকিলেও তাকে নিজের অধীত বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞানগরীয়সী করিবার জন্য তাঁর একান্ত আগ্রহ। মা যেদিন তাকে সঙ্গে লইয়া গোকুল পিঠে, আনারসের জেলি অথবা মাংসের কচুরি তৈরী করিতে ব্যাপৃত থাকিতেন, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া প্রফেসরের মনের শান্তি থাকিত না। অবশ্য মুখ ফুটিয়া বড় একটা কিছু বলিতেন না,—এটাও বুঝিতেন মেয়ের পক্ষে এসব সৃষ্টির অধিকার থাকার একটা মূল্য আছে,—তথাপি এসব বিদ্যা যে ঘোড়ার মত ছুটিয়া পালাইবে না, এ যুক্তিটাকেও তিনি মনে মনে খুবই অযৌক্তিক ভাবিতে পারিতেন না। আহারে বসিলে কুরঙ্গিনী পাখা হাতে পাশে বসিয়া যখন হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন হয়েছে গো? এসব সুমি নিজে করেছে।"

ঈষৎ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিতেন, "Not so bad; but"—কুরঙ্গিনী ভুরু কুঁচকাইয়া তাঁর সেই দুই চোখ মেলিয়া চাহিতেন যার জন্য তাঁর নাম হইয়াছিল, কুরঙ্গিনী—"But"? থামলে কেন, বল? 'But'-এর চাইতে ও তোমার আওড়ায় ভাল, চসার পড়ে কারেক্ট?"

ভদ্রলোক শুধু হাসি হাসি মুখে চোখ তুলিয়া বারেক স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কিতমুখী কন্যাকে কহিতেন, "দে'ত রে মিতা, তোর মাকে একটা প্যারা চসার শুনিয়ে। ওগো কুরুবক! চসারকে তোমার যতটা অসার ভাবো মোটেই তা নয়! ওর যে একটা নিজস্ব ঝঙ্কার আছে, তারতো আর স্বাদ জান না! তোমার দৌড় তো টেনিসনের 'ডোরা' পর্য্যন্ত। দাও দেখি এই পিঠে আর একখানা। দেখ, সত্যিকার ম্যাডাম কুরি রেডিও বার করে বিশ্ব-বিখ্যাত হলেন, আর তুমি গোকুল পিঠে আবিষ্কার করে হলে না? হওয়া উচিত ছিল কিন্তু।"

রামধনুকে গুণের মত সেই জোড়া ভুরু আবার উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইত,—"থাও,—আমি কেন গোকুল পিঠে আবিষ্কার করতে যাব, ওতো আমি আমার দিদি-শাশুড়ীর কাছে শিখেছি।"

"তাই নাকি? আমি জানতুম এসব বিংশ-মধ্য শতাব্দীর রিসেণ্ট আবিষ্কার! তোমার দিদি-শাশুড়ীকে কোথায়ই বা পাচ্ছি, তোমাকেই তাঁর ওয়ারিসান হিসাবে ভাবছি একটা প্রাইজ দিয়ে দেব। নোবল পুরস্কার না হলেও সেটা বিশেষ আন্‌নোবল হবে না।"

কুরঙ্গর মুখের দিকটা এবার দেখা গেল না। সুমিত্রা হেঁট হইয়া পিঠের কাঁসি হইতে একটা ভাল দেখিয়া পিঠা বাছিতেছিল, ফিক্ করিয়া একটা মৃদু হাসির মৃদু শব্দ শুধু তার কানে ভাসিয়া আসিল। সে যখন তার বাবার পাতে খাবার দিল, তাঁর চোখের একটা প্রেমে-গলানো হাসির ছটা এক লহমার মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিল। এ বস্তুটাকে বড় বেশী দেখাশোনা থাকায় চিনিতে যে আটকায় না! মায়ের গাল দুটিতেও ঐ একই রং তার চোখে পড়ায় সে একটুখানি সলজ্জ হইয়া একটা ছুতা করিয়া সেই ঘরেরই অন্যপ্রান্তে চলিয়া যায়।

কুরঙ্গের বয়স তখন মাত্র ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে। নীরেন্দ্র তার চাইতে পাঁচ বৎসরের বড়। কৈশোর বিবাহের মাধুর্য্য ও প্রগাঢ় প্রেমে দুজনকারই প্রাণ

কানায় কানায় ভরপুর, শুষ্ক হইয়া যায় নাই। হাসি-তামাসা এমন কি সম্প্রতি মেয়ে বড় হওয়ায় তাকে একটুখানি সমীহ করিতে হইলেও অভ্যাসের দোষে, কুরঙ্গিনী আজও স্বামীকে বিতর্কস্থলে পবাজিত হইলেই মুখ ভেঙ্গায়,—চিমটি কাটে। স্বামীও রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠেন, "দাঁড়াও তো, সেবাবের মতন দোব ঐ কোঁকড়ান চুলের টিকি কেটে! এখন তো আব মা নেই, যে লাগাতে যাবে।"

কুরু হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "সবাই বলে সুমিত্রা আমার শাশুড়ী ঠাকুরুণ মরে জন্মেছেন, আর সেই জন্যেই তুবি ওকে অত ভালবাস।"

"মল্লিনাথ, সাক্ষাৎ মল্লিনাথ! যাদের মা মরবার আগে মেয়ে জন্মেছে, তারা কেউ-ই আব তাদেব মেয়েকে কোন দিনই ভালবাসেনি? না-গো?—তবে হ্যাঁ সে বটে তোমাদেব পক্ষে!"

সতেজে প্রশ্ন ওঠে, "তার মানে?"

"অতি সরল! সতীন-ঝিকে তো সৎমায়েরা কক্ষণো ভালবাসে না,—তা আমাদেব মেয়েদেব ভিতর তো সতীন-ঝি থাকে না,—তাই মেয়ে জন্মালেই আমরা ভালবাসি।"

"না, থাকে নাই তো, তার মানে, তোমাদের মত আমরা বহুচারী প্রজাপতি নই।"

"তাই বটে! তারই জন্যে অধুনা আমাদেব সঙ্গে এই নিয়ে দারুণ ভাবে লড়তে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবীর মানে?"

কুরঙ্গিনী সক্রোধে জবাব দিল, "তোমাদের সতীন-ঝি তৈবী কবা? আর বুঝি কোনই ভাল উদ্দেশ্য নেই ওর মধ্যে?"

"হুঁ, আছে বইকি! তবে সে সব গৌণ, ডাইভোর্সটাই মুখ্য!—মূলচ্ছেদ হলেই ফল-ফুল-পল্লব সবই হাতের কাছে পৌঁছে যাবে, কি বল কুরুচি-লতা?"

"না, পৌঁছাবে না! তোমাদেরই সব চালাকী! মেয়েদের বোকা বানিয়ে,

নাই দিয়ে দিয়ে আইন বদলিয়ে পুরুষেরাই যাতে বাঁজা বলে, রোগী বলে, বদনাম দিয়ে স্ত্রীদের ত্যাগ করে আবার বিয়ে করতে পারে তারই চেষ্টা। এদেশে মেয়েদের এই তো শিক্ষা! আর সম্পত্তি, এতে কে আবার ডিভোর্সিদের বিয়ে করবে শুনি? কুমারীদেরই বিয়ে হয় না। বিধবা বিয়ে চলেনি যে দেশে সে দেশে সধবা বিয়ে চলবে? হবে পুরুষদেরই চৌদ্দ আনা লাভ।"

"বাপের সম্পত্তির অংশ পেলেই হবে। ধর্মান্তরিত হয়ে হচ্ছে না কি আজকাল?"

রাগ করিয়া সুমিত্রার মা উঠিয়া গেলেন,—বলিতে বলিতে গেলেন, "বাপেদের বিষয় তো বসে বসে কাঁদছে! যার আছে সে দিয়েই থাকে, পয়সাওয়ালারা যা' করবার করেই থাকে, গরীব-গৃহস্থদের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশাই থেকে যাবে। মাঝখান থেকে ঘরে ঘরে ভাগ-বাঁটোয়ারা, আত্মকলহে উকিল ব্যারিষ্টার, গভর্ণমেণ্ট বেশ কিছু করে খাবেন। ভাইয়ের আশ্রয় যাবে, কুমারী বোনের বিয়ে ভাই দেবে না। স্বামী-শ্বশুরের বিষয় আইন মত মেয়েরা বড্ডই পাচ্চে! নীতিজ্ঞান যত ফুরচ্ছে ততই মানুষ আইন হাতড়াচ্চে। নূতন নূতন আইন তৈরী করলেই তো আর মনুষ্যত্ব উদ্ধার হয় না।"

নীরেন্দ্র উচ্চাহাস্য করিয়া উঠিলেন, "দুয়ো! তর্ক করতে পারলে না, পালিয়ে গেলো!"

দরজায় মুখ বাড়াইয়া কুরঙ্গিনী ধমক দিল,—"থামাও হাসি, মোটেই পালাচ্চিনে,—ডাল চড়িয়ে এসেছি, মেয়ে তো তোমার ইংরেজীর তরজমা করছে, না যাই যদি বিন্দি পোড়ার মুখী একঘটি জল ঢেলে পানা পুকুর তৈরি করে রেখে দেবে, তখন কিন্তু ফেলতে দোব না, দোব গায়ে ঢেলে।"

এক ফাঁকে আসিয়া স্বামী-পুত্রীকে দেখিয়া গেল, হাত পাখায় হাওয়া খাইতে খাইতে বলিয়া গেল, "ভাত চড়িয়ে আসছি। তর্কে আমি হারিনি, 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ' মনে রেখ। মেয়েদের বন্ধু সেজে যারা তাদের দুর্দ্দশা বাড়ায় আমি

তাদের শত্রু মনে করি। চাই শিক্ষা, চাই আইন প্রত্যয়, আইন করে হয় না।

নীরেন্দ্র বলেন, "যো হুকুম ম্যাডাম! মনে আছে এবং থাকবে, যেহেতু এটা তোমার মুখের বাণী,—শুধু শাস্ত্রকারদেরই নয়।"

সে দিনগুলো তার এ জন্মের না পূর্ব্বজাত আর কোন জীবনের? সত্য হইলে কি তারা এমন নিঃশেষে মুছিয়া যাইত?

পাশের ঘরে কথাবার্ত্তার সাড়া পাওয়া গেল। অসীম আসিয়াছে। আজ সকালেই আসিয়াছিল। বর্ষার দিনে সে খিচুড়ি খাইতে ভালবাসে বলিয়া সুমিত্রা খিচুড়ির সঙ্গে খাইবার জন্য মাছের চপ্ ও কচি আমের চাটনী রাঁধিয়া দিয়াছে, খিচুড়ির মশলাপাতি ঠাকুরকে বুঝাইয়া দিতে, ভুল তার হয় নাই।

অসীম বলিতেছিল, "অমল তা'হলে বিয়েতে মত দিয়েছে? হ্যাঁ, বড় মামিমা! সে কথা তোমায় আমি অনেক আগেই তো বলেছিলাম।"

কৈলাসবাসিনী কহিলেন, "আমিই কি চেষ্টা করিনি মনে করছো? দেখছোই তো বাবা ছেলেটি এক রকমের! সুমিত্রাকে বিয়ে করতে ওকে কিছুতেই রাজী করাতে পারলুম না, এখন নিজের পছন্দে কোথায় যে কি ঠিক করে বসলো তাও তো বুঝতে পারছিনে। সেই এক মহা ভাবনা হয়েছে আমার।"

"সেকি? ওর সঙ্গে হচ্ছে না? কেন?"

"তা জানিনে। বলেছে, ওকে বিয়ে করবে না। আর আমিও বলি, সে হয়ত ভালই হয়েছে। ও আমার সুমির যোগ্য নয়, নিজেদের ঘরের ছেলে হলেও হক কথা বলব।"

"আচ্ছা বড় মামিমা! কারুর কখন তুমি যোগ্য বিয়ে হতে দেখেছ?"

"অনেক,—কেন দেখব না!"

অসীম জিদ করিয়া বলিল, "দু'চারটের নাম করত মামিমা! আমি বলছি,—ও হয় না। অন্ততঃ আমি দেখিনি। আমার মা-বাবার একটুও মনের মিল

ছিল না। অবশ্য তোমার কথা আলাদা! তুমি যে 'মিল' করবে বলে তৈরী হয়ে বসে আছ,—সেই দিক থেকে দেখলে সুমিত্রা দেবীই অমলের পক্ষে উপযুক্ত। ওকে যে বিয়ে করবে,—রাগ করো না,—তার অনেকখানি সহ্যগুণ থাকা চাই! তা হলে হচ্ছে কোথায়? মেয়েটি কাদের?"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ ক্ষীণ হইয়াও এত দূরে ভাসিয়া আসিল, কৈলাসবাসিনী উত্তর দিলেন, "সব কথা তো খুলে বললে না, শুধু বললে, সে সুমিত্রার চেয়ে ঢের সুন্দর, আর সে তার কোন বন্ধুর শালী,—পাকা হলে খবর দেবে বলেছে।"

"স্বজাতি—স্বঘর?—না তাও বলেনি?"

"তা তো কই জিজ্ঞেস করতে মনে পড়েনি, রে! অতটা কি পারবে? জানলে ইনি হয়ত অতটাই সহ্য করবেন না। এটা কি ভাববে না? হ্যাঁবে?"

অসীম অল্পক্ষণ কথা কহিল না, একটু পরেই তার মন্তব্য শোনা গেল,—"ওরা সব সখের কম্যুনিষ্ট। ওরা তো তোমাদের মত জাতটাত মানে না কিনা, তাই বলছি। কমরেডদের মধ্যে কেউ হলে ও সকল কুসংস্কারে তো বাধবে না। মামাবাবুর যদি আপত্তি থাকে, এই সময়ে খোঁজ-খবর নিয়ে যা পার কর। পরে আপসোস করে কোন ফল নেই।"

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল, "তা'হলে তুমিই খোঁজ করে দেখ না বাবা, নইলে আমি আর কার কাছে খবর নেবো? কিরে যদু?—টেলিগ্রাম? কে আবার টেলিগ্রাম করলে? কই নিয়ে আয় না।"

"সরকারবাবু সই করছেন।"

"আচ্ছা আমি দেখে এসে বলছি, তোমার নূতন বৌ-মার খবর এলো হয়ত! যাও ওঠো, কলাতলায় বরণডালার জোগাড় করো।" বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া চটিজুতার চট পট শব্দ উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

সুমিত্রার এই উপলক্ষ্যে আর একদিনের কথা স্মরণ হইল। সেদিনও সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নয়, এই রকমই দৈবক্রমে হঠাৎ এই ধরনেরই কথাবার্ত্তা শুনিয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে কথা মনে করিতে আজও সে দারুণ একটা লজ্জানুভব না করিয়া পারে না।

অমল ও কৈলাসবাসিনীতে কথা হইতেছিল। প্রথমাংশটা সে শোনে নাই, ঘরে ঢুকিতেই পাশের ঘরে অমলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—

"তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ, ওসব দেখতে শুনতে পাও না, আমরা পাই! সুমিত্রা অসীমকে ভালবাসে,—আমাকে বাসে না।"

দুঃখিতকণ্ঠে কৈলাসবাসিনী ঈষৎ গম্ভীর স্বরে কহিয়া উঠিয়াছিলেন,—"ছিঃ! কুমারী মেয়ের নামে ওসব কথা বলো না। তোমারই বা কি অযত্ন সে করেছে?"

যথাপূর্ব্বভাবে অমলাংশু জবাব দিয়াছিল, "যত্ন আর ভালবাসা এক বস্তু নয় জ্যেঠাইমা! অসীমের দিকে কিরকম করুণ চোখে ও চায় সে তো তুমি লক্ষ্য করোনি,—আমায় যত্ন নিশ্চয়ই করে, কিন্তু পছন্দ আমায় করে না। সেটুকু বোঝবার জন্যে পি. আর. এস. হবার দরকার করে না, বিদ্বান না হতে পারি, এটুকু বুঝি।"

তারপরই সে নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়া তার নিজের চরিত্র চিত্রণ গোপনে শোনার অভদ্রতা হইতে আত্মরক্ষা করে।

অমলাংশুর মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এতটা শক্তি যে আছে সে কথা সে জানিত না! ভালবাসাবাসির কথা নয়, অসীম অমলাংশুর তুলনায় শ্রদ্ধার পাত্র বৈকি! তবে সে বিষয়ে কোনরূপ বহিঃপ্রকাশ সে স্বেচ্ছায় নিশ্চয়ই করিতে চাহে নাই। কৈলাসবাসিনীর আন্তরিক বাসনা সে বুঝিতেই তো পারিয়াছিল এবং তাঁর কাছে তার ঋণ তো আর সোজা নয়!

মেঘ-মেদুর আকাশে বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া বজ্র হাঁকিয়া উঠিল, বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইল, সুমিত্রা তার চিন্তাধাবায় ফিরিয়া আসিল ;—

তারপর একদিন শবতের নির্ম্মেঘ আকাশে অশনিভরা কালমেঘ ঘনাইয়া উঠিল। বাহিবে ধূম-জ্যোতি সলিল-মরুতের সমষ্টি নয়, তার উদয়-স্থান মানুষের ভাগ্যাকাশে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক্ সারিয়া বাড়ী ফেরার পথে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে কুরঙ্গিনী অর্দ্ধমৃতা হইলেন, কিন্তু মরিলেন না। হায় সেদিন যদি তাঁর মৃত্যু হইত!

সুমিত্রা হঠাৎ উদ্বেলিত হৃদয়টাকে দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল। যদি তার মা সেদিনের সে ঘটনায় মরিয়া গিয়া বাঁচিতে পারিতেন, তবে দুই বৎসর কাল তাহাকে বহু ঝঞ্চার আঘাত খাইয়া আসিয়া অবশেষে দয়াবান ধনীগৃহের আশ্রিতা হইয়া তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত না। যত সুখেই তাকে বাথা হউক, তথাপি সে সেই স্বর্ণ-পিঞ্জবের পোষা পাখীই।

অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় কুরঙ্গিনী যে অবস্থায় বাঁচিয়া উঠিলেন, অতিবড় শত্রুব জন্যও সে অবস্থা অবাঞ্ছিত। সেই হাস্যময়ী, প্রেমময়ী, সুচঞ্চলা, শিক্ষিতা, চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা কুবঙ্গিনী ঘোর উন্মাদিনী হইয়া তাঁর অত আদরের স্বামী-কন্যার জীবনেব মহাভীতি প্রদায়িনী এবং দুর্ব্বহ হইয়া উঠিলেন। নিজের কত সাধেরই সাজান সংসার,—তাঁরই অপূর্ব্ব সূচীশিল্পের কারুকার্য্যযুক্ত পর্দ্দা, টেব্‌ল-ক্লথ, আসন, কুসন নির্ম্মম হস্তে ছিঁড়িয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া সংসারকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। প্রতিদিন ছবি, আয়না, বিছানা, বালিস, ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া পথে পড়িতে লাগিল। এত অকথ্যভাষাই বা তাঁর সেই পূর্ব্বেকার সুভদ্র শিক্ষিত মনে কে জোগাইয়া দিতে লাগিল! ডাক্তার পরামর্শ দিলেন রাঁচি পাঠাইবার। নীরেন্দ্রনাথ শান্ত স্বরে কহিলেন, "সে আমি পারবো না। যদি কখনও ভাল হয়, তখন ওর কাছে মুখ দেখাবো কি করে?" ডাক্তারের দু'হাত চাপিয়া

ধরিলেন, "ওকে ভাল করুন, যা করলে হয়,—যত টাকা লাগে আমি যেমন করে পারি দোব।"—

সুমিত্রা কাঁদিতে কাঁদিতে পালাইয়া গেল; গিয়া দেখিল, নিজের আলমারি খুলিয়া সমস্ত পোষাকী সাড়ী-ব্লাউজের গাদা সাজাইয়া মা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া দু'হাত তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন। মেয়েকে দেখিয়া খিলখিল হাসিয়া পরম পরিতোষের সহিত কুরঙ্গিনী কহিয়া উঠিলেন, "যাক আপদের শান্তি হ'ল! অগ্নিদেবতাকে কি বললুম জানিস?—শোন, 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে'—শেষ কথা-গুলিতে সেই পূর্ব্ব সুরের ঝঙ্কার উঠিল।" তা যাক এসব তো পদে ছিল, হঠাৎ খেয়াল উঠিল—বাপে-মেয়েতে নাকি তাকে খুন করিবার পরামর্শ আঁটিতেছে!—একদিন স্পষ্টই রাঙ্গা চোখে চাহিয়া ধমকাইল, "দেখ, যদি বাঁচতে চাও, ও মতলব ছেড়ে ফেল। মনে করেছ কি আমায় পাগল সাব্যস্ত করে ত্যাগ কববে, আর এক নতুন গিন্নি ঘরে এনে মনের সুখে নতুন করে ঘবকন্না পাতাবে? সে হচ্চে না, আমি বেঁচে থাকতে, হতে দিলে তো! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—মরি তো তোমায় সহমরণে নিয়ে মরবো, রেখে যাবো না। কক্ষনো না।"

ঘূর্ণিত নেত্রে মেয়ের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কেন, কেন যাবে না? ওর ঠাকুরদাদার মা তার বরের সঙ্গে সহমরণে যায়নি? গেছলো কিনা? তবে?—মেয়েরা যদি যেতে পারে, পুরুষই বা সহমরণে যাবে না কেন? যেতেই হবে, আইন-সভায় আমি এ আইন পাশ করাবোই—করিয়ে তবে ছাড়বো।—পুরুষরা যা কচ্ছে, মেয়েরা যদি তাই পেতে চায়, তাহলে মেয়েরা যা করেছে, পুরুষরাও আগে তাই করুক।"

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সুমিত্রা বাপের কাছে গিয়া ডাকিল—"বাবা!"

"কি রে, মিতা?" নীরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যেন বিদেহী আত্মার পরলোক হইতে ভাসিয়া আসার মত প্রাণহীন নিস্পন্দ ধ্বনি। অশ্রুজলের আবেগে অবরুদ্ধ-

প্রায় কণ্ঠকে কোনমতে আয়ত্ত করিয়া লইয়া সুমিত্রা বলিল, "মাকে না হয় ডাক্তার-বাবুর কথামত কিছুদিন রাঁচিতেই—"

সুমিত্রা অকস্মাৎ সর্বাঙ্গে শিহরিল। সেদিনও এই রকমই সে তার পিতার আর্তকণ্ঠের ব্যাকুল অভিব্যক্তিতে সর্বদেহে চমকাইয়া তার আরব্ধ অভিমত অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

"না, না, মিতা, তুমিও আমায় ও-কথা বলো না, আমি পারব না। ওকে আমার কাছ ছাড়া করতে আমি পারব না।—চোখ ছাড়া কাছ ছাড়া করব ওকে ওর এই অবস্থায়? যখন ওর সব চাইতে আমার-কাছে থাকাব বেশি দরকার—সেই ওর সবচেয়ে বড় দুর্দ্দিনে!"

সুমিত্রা তাব ধৈর্য্যের বাঁধ আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, তথাপি শেষ চেষ্টায় নিজেকে দৃঢ়তর করিল, নিষ্ঠুরের মতই কহিল, "কিন্তু তাতে ওর তো কোন লাভ হবে না বাবা! বরং সেখানে গেলে সেরে যেতেও তো পারেন। যে সব কথা বলেছেন, যদি"—এই সময়ে ধৈর্য্য হারাইয়া চৌকিখানার উপরেই হাতলে মাথা গুঁজিয়া হু হু শব্দে সে কাঁদিয়া উঠিল। একমাত্র সন্তান সে, কি আদরেরই আদরিণী মেয়ে, তারই মুখে তার দুর্ভাগিনী মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় ঘৃণিত অভিযোগ ও অবিশ্বাস! এও সহ্য হয়?—

নীরেন্দ্রনাথ কিন্তু একটুও বিচলিত হইলেন না। উঠিয়া আসিয়া মেয়ের লুকানো মুখ দু-হাতে তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে সোজা করিয়া বসাইলেন, নিজের কোঁচার কাপড়ে তার অশ্রু মুছাইয়া দিতে দিতে একান্ত আশাপূর্ণ অথচ শুষ্ক স্বরে কহিলেন, "তুমি কি ওসব কথায় বিশ্বাস কর মিতু? ওর কথার কি আজ কোন দাম আছে? ভুলে যেও না আমাদের 'পরে ওর কি অদ্ভুত ভালবাসা! অতবড় শিক্ষিতা মহিলা সে, একদিন একটা রাঁধুনী রাখতে দেয়নি, পাছে আমাদের খাবার কষ্ট হয়! তোমার আমার অসুখ হলে সারারাত বসে কাটিয়েছে, কেউ

ওকে এক ঘণ্টার জন্যেও নড়াতে পেরে ওঠেনি, তোমার সেই মা ও।"

সুমিত্রা হঠাৎ রুক্ষভাবে বাপের দিকে ফিরিল; "সেই মা তো আর নেই, বাবা! সেই মা থাকলে আজ তাঁর সংসারের এই অবস্থা? সে মা তো আমার—সেইদিনের সেই ভীষণ অ্যাক্সিডেণ্টে মারাই গেছেন! তুমি ডাক্তারের কথা শুনলে কিন্তু ভাল করতে, উঃ এর চেয়ে মা যদি সেদিন মারা যেতেন—!"—

"সুমি! কি ভাল হত তাতে? এ তো আমি মনের মধ্যে তবু আশা করছি,—আর সত্যই হয়ত একদিন সেরে যেতেও তো পারেন! যায়ও তো অনেকে সে রকম।"

কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল কিভাবে এবং কোনদিক দিয়া,—ও কেমন করিয়া? সে সত্যই এক ভয়াবহ ও মর্ম্মান্তিক কাহিনী!—

এই আজিকার মতই বৃষ্টি অধ্যুসিত বাদলরাত্রি। সঙ্গে ঝড়েব হাওয়ার মাতামাতিও কম ছিল না। চাবিদিকের খোলা জমিতে নির্ব্বিরোধেই সে ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর মতই দুর্দ্দান্তভাবে গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দ ও ঝড়ের গর্জ্জন ডুবাইয়া দিয়া সম্বর্ত্তাদি মেঘ কুলিশ কঠোব কণ্ঠে নব নব আদেশ প্রচার করিয়া সেই প্রলয় বাত্রিব ভীষণতা বর্দ্ধিত করিতেছিল। বিদ্যুতের লেলিহান তীক্ষ্ণ ধার সহস্র ফলাব ছুরিকা মধ্যে মধ্যে প্রকৃতির বিদীর্ণ অবয়বের আভ্যন্তরিক বীভৎসতার মতই শোচনীয় দেখাইতেছিল। সে সব দৃশ্য দেখিবার জন্য তখন কিন্তু একজন বই দ্বিতীয় কেহ জাগিয়া ছিল না এবং সেই যে ছিল, তারও চিত্ত তখন বিষয়ান্তবে এমনি নিগূঢ়ভাবে নিমগ্ন যে, জগতের আর কোথাও আরও কি ঘটিতেছে সে সংবাদ রাখিবার অবকাশ তার নাই। দারুণ দুর্গন্ধে এবং সেই সঙ্গে শ্বাস কৃচ্ছ্রকর ধূমের প্রভাবে যখন সুমিত্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন অগ্নির তাপ ও তেজ অতি প্রখর হইয়া উঠিয়া তার পাশের ঘরে কোন হৃদয়বিদারী দুর্ব্বিসহ প্রলয় কাণ্ডের অভিনয় ঘটার প্রমাণ করিয়া দিতে মুহূর্ত্তার্দ্ধ কালও বিলম্ব করিল না। এক্ত

বড় বৃষ্টি না আসিলে এতক্ষণ সমস্ত বাংলোবাড়ীই অগ্নিময় হইয়া যাইতে বাধিত না।

পেট্রোম্যাক্সের পেট্রোল আনিয়া খুবই সম্ভব ঘুমন্ত স্বামীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার কাপড়ে গেঞ্জিতে উন্মাদিনী আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। দরজার ভিতর দিক দিয়া তালাবন্ধ। তবে সুখের কথাটুকু এই যে, নিজেকেও সে এই কাণ্ডের পর বাঁচিয়া থাকিতে দেয় নাই!—স্বামীর সহিত একই অগ্নিতে তাঁর পাশাপাশি শুইয়া স্বেচ্ছাসুখে নীরবে দগ্ধ হইয়াছে। নীরেন্দ্র দ্বার খুলিবার বা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়। সুদৃঢ় কবাট ভাঙ্গিবার সাধ্য হয় নাই, হয়ত তাঁহারই শেষ সময়ে তিনি জলন্ত স্ত্রীকে নিজের অগ্নিদগ্ধ বক্ষে টানিয়া লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। যে আসন্ন বিচ্ছেদকে যেকোন মূল্য দিয়াও তিনি ঠেকাইয়া রাখিতে প্রাণপণে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে লড়িতেছিলেন, একটিমাত্র মুহূর্ত্তেই তাহার গতি সহজ সমাধান হইয়া গেল।

সুমিত্রার স্মৃতির মধ্যে বর্ষণক্লান্ত বর্ষা-রাত্রিব অনির্ব্বাণ-স্মৃতি আজ দুই বৎসর ধরিয়া তাহাকে অনবরত তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। চোখ বুজিলেই সেই অস্বাভাবিক দুর্গন্ধময় ধূম-ব্যাপ্তিতে রুদ্ধশ্বাস জাগরণের অভিজ্ঞতা আজও তার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দেয়। এমন রাত্রে সে যেন আজও ঘুমাইতে ভয় পায়। জগতের বক্ষে নামিয়া তার যে সুহৃদ্‌তম নবতর সৃষ্টি করিয়া তাকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরিয়া দেয়, সে—ইহার বুক্ষে সীমারেখা শূন্য রুদ্র মরুভূমির ধূ-ধূ বালুকার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে!

আজও অতীতের সেই ভয়াবহ দৃশ্য তার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে-ছিল,—ঠিক সেই রকমই সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে!

পুলিস, হাসপাতাল, শ্মশানক্ষেত্র, আদালত, কতকিই—।

দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে অশ্রুহীন রুদ্ধশ্বাসে হাঁপাইতে লাগিল। তার চোখের সব জলই কি সেদিনের আকাশ চুরি করিয়া লইয়াছে?

সামনের বারান্দায় কৈলাসবাসিনীর ব্যগ্রকণ্ঠ শোনা গেল,—"কিসের টেলিগ্রাম

রে, অসি ! কে কি খবর দিলে রে ? তোর ভাই ?"

উত্তর শোনা গেল, "খবর মোটেই ভাল নয়,—বড-মামিমা !"

"কি ? কি লিখেছে ? অজ্ঞাত-কুজ্ঞাত ? বিধবা না সধবা ? কি ব্যাপার বল্ না ? চুপ করে রইলি কেন ? বল তুই শুনতে আমায় হবেই তো ।"

"সে সব কিছুই নয়, এ তার অমল করেনি ।"

"তবে কে করেছে ? হ্যাঁরে তুই অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলি কেন ? কি বলবি বল না, অমু ভাল আছে তো ?"

সুমিত্রা সচকিতে কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল, অতীত দূরে সরিয়া গিয়া একটা আসন্ন অমঙ্গলের নিদারুণ সম্ভাবনায় তার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই রাত্রি,—এই সেই অতীতের ভীষণ রাত্রি,—কি সত্যই সে তাকে অনুসরণ করিয়া এখানেও ফিরিয়া আসিল ? তার কি কোথাও শান্তিতে পড়িয়া থাকিবার উপায় নাই !

"কি বলবো বড় মামিমা !"

বারান্দা হইতে বাষ্পাবেগ-জড়িত দ্রুত উচ্চারণে স্নেহা-তুরা মামিমার ব্যকুল প্রশ্ন একান্ত অসহিষ্ণু কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিল ;—

"ওরে বল্, বল্, আমার অমল কি ভাল নেই !"

"সে এই কতক্ষণ মাত্র মেডিকেল কলেজে মারা গেছে !"

"মারা গেছে ! কি হয়ে ?"—

"মোটাব অ্যাক্সিডেণ্টে। বিশেষ প্রকার মোটারের ধাক্কায় ।"

ভাই

সুশোভনের বাপ যখন স্বর্গতঃ হন তখন সাত এবং তার কয় বৎসর পরে মা যখন মারা যান, তখন তার বয়স দশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সুশোভনের দাদা সুদর্শনের বয়স তার বাপের মৃত্যুকালে সতের পার হইয়া অষ্টাদশে চলিতেছে। তখন সে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য দরখাস্ত হস্তে ছুটাছুটি করিতেছিল। দুবারেই পরীক্ষার ফল তার বিশেষ ভাল, এ ছাড়া বড় অভিভাবকের সহায়তা তার আদৌ নাই এবং তার চাইতেও তার শিবপুর প্রভৃতি বাংলাদেশের কলেজে স্থান লাভ করার পক্ষে মস্ত বড় বিরুদ্ধতা সে বাংলার বাহিরের ছাত্র। পাটনা, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি, বাঙ্গালোর, পুণা কোথাও আবেদন পাঠাইতে তো আর সে বাকি রাখে নাই। তার বাপের বহুদিনের পরিত্যক্ত টাইপ রাইটারটাও তারই মত এ বিষয়ে অশ্রান্তভাবেই খাটিয়া গিয়াছে, সহানুভূতিহীন কর্তৃপক্ষদের মত তাচ্ছিল্যভরে বিগড়াইয়া গিয়া তাকে একটুও বিব্রত করে নাই। এদিকে মা তখনই তাঁর মরণশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যে এখনই সবটা না বুঝিলেও তিনি নিজে তাঁর হৃদযন্ত্রের অনিচ্ছুক শিথিল ক্রিয়া অনুভব করিয়া তাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছিলেন। বিগড়ানো কলের সিলিংফ্যান, ঘড়ি, সেলাইএর কল বা বিদ্রোহী চাকরেরই মত তাঁর কর্ম্মশক্তি ক্ষীণ হইতে নিত্যই ক্ষীণতর হইতেছিল, প্রতিক্ষণের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে মুখ কালো করিয়া যেন বলিতেছিল, "আমায় এইবার জবাব দিন।" নিজের এই অবস্থায় একমাত্র সহায় কিশোর পুত্রটিকে অতদূরে পাঠানো যে কতবড় অসঙ্গত কার্য্য সে তিনি

ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া মনে মনে শিহরিয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে মা, মা তো নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে পারেন না—এমন কি জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতের মুখাগ্নির লোভেও না।

তাই যখন সুদর্শন পুণা ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানপত্র হাতে করিয়া ঈষৎ প্রদীপ্ত ঈষৎ সন্দিগ্ধ মুখে আসিয়া বলিল, "এত জায়গায় কেউ নিলে না, অথচ অতদূর থেকে ওরা রাজী হলো; কিন্তু হলে কি হবে, তোমার শরীর এত খারাপ—আমি তো তোমার ফেলে যেতে পারবো না মা, কাশী কি পাটনা হলে তুমি শুদ্ধ যেতে পারতে, তাতো হল না। ও ছেড়েই দিই।"

মার দুর্ব্বল বুকে এ সংবাদ প্রবলবেগেই ধাক্কা লাগিয়াছিল, কিন্তু বড় মনের কষ্টে সে অবস্থা চাপিয়া রাখিয়া তিনি একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিলেন, কহিলেন, "কি যে বলিস! মা ঘাড়ে করেই বুঝি ছেলেরা পড়তে যায়? শরীর ভাল নেই, এইবার তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলেই অনেকটা ভাল হবে, তা ছাড়া বাড়ী ঘরে থাকবো, ঘর-বনিয়ার মা আছে, গিরধারলাল আছে, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।"

সুদর্শনের নিজের ইচ্ছাও এতে যে না ছিল তা নয়। সে ইঞ্জিনীয়ার হয় এ ইচ্ছাটা ছিল খুব প্রবলভাবে তার বাপেরই। ছোটবেলা হইতে টুকিটাকি মেরামত ও নতুন সৃষ্টির দিকে সুদর্শনের বেশ একটা ঝোক ও আগ্রহ ছিল। যেমন কাঠের পাতলা চিল্‌কা পাইলে বা মোটা পেষ্ট বোর্ড কাটিয়া খেলনার বাড়ীঘর, টেবিল চেয়ার তৈরী করা, পুরনো ঘড়ি খুলিয়া মেরামতের চেষ্টা, টিনের চাকতি দিয়া ও পরিত্যক্ত ইলেকট্রিকের তার জুড়িয়া এরোপ্লেন ও টেবিল ফ্যানের মডেল গড়া—এইসব নানান শিল্পজাত সে অতি নিপুন ভাবেই করিত। লক্ষণ দেখিয়া পিতা বলিতেন, "জেনারেল লাইনে ওকে দেবো না, ও জাত-ইঞ্জিনীয়ার।" ছোটবেলা হইতে একথা তো বরাবরই শুনিয়া আসিতেছে, বাপের অকাল মৃত্যুর পর হইতে

তাই এ বিষয়ে সে দৃঢ়সঙ্কল্পই হইয়াছিল, আর কিছু না হোক সে কার্পেণ্টারীও শিখিবে, তবু অন্য কিছু করিবে না। কিন্তু মায়ের চেহারা কি অস্বাভাবিক শীর্ণ হইয়া গিয়েছে! গায়ের সেই উজ্জ্বলবর্ণ পাণ্ডুরাভ হইয়া গিয়া যেন সুস্পষ্টরূপেই বুঝাইয়া দিতেছিল। গায়ের রক্ত তাঁর যেন কোন শোনিতপায়ী জীব শুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহাকে তাড়াইতে কাহারও সাধ্য নাই। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই এই নিরভাবক ছেলেটিকে ঈষৎ ভদ্রভাষায় এই কথাটাই তো বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে তাঁরা অবশ্য একেবারেই হতাশার চরমবার্ত্তাটা জানান নাই, তা তাঁরা সহজে জানানও না, তা করিলে রোগীর আপনার জন বাঁচিবে কেমন করিয়া?

মার রোগক্লিষ্ট শুষ্ক শান্ত মুখখানির পানে চাহিয়া লইয়া সুদর্শন কহিল, "না মা, আমি বি. এ.-ই পড়ি তা হলে স্কলারশিপটাওশুপাবো আর কাছাকাছিও হবে, সেই ভাল।

মা আবার সেই শীর্ণমুখে মৃদু হাসিলেন, তৈলহীন সলিতার মতই তাহা একবারমাত্র দীপ্তিহীন আলোক বিতরণ করিল; ধীর প্রশান্তস্বরে কহিলেন, "দাসু! তোমার বাবার কথা এর মধ্যেই ভুলে গেছ? মা তোমার মরবে না, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভর্ত্তি হও গে, তুমি তাঁর বড় ছেলে, তাঁর সাধ অপূর্ণ রেখো না।"

সুদর্শনের অবচেতন মনের মধ্যে হয়ত এই কথায় প্রসন্ন আশ্বাস জাগিল কিন্তু তার সচেতন মন তাহাকে প্রশ্রয় দিল না, ঈষৎ সংশয়াচ্ছন্ন থাকিয়াই সে অন্য একটা যুক্তি দেখাইল, দৃঢ় সংশয়ে কহিল, "আমি চলে গেলে সুভুকে কে দেখবে মা? ও যে আর কারু কাছে পড়ে না, কারু সঙ্গে একবেলা ভাত খায় না,—যতক্ষণ না আমি এসে গল্প বলি রাত্রে ঘুমোয় না, ও কি করে থাকবে?"

এবার মার ধৈর্য্য ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হইল। সত্য, অতি সত্য একথা! সুদর্শনের পর দুটি সন্তান তাকে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, সুশোভন যখন তাঁর

গর্ভে, তখন তিন বৎসরের মেয়ে মণিকা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালায়, সেই শোকের ভিতরেই শিশুর জন্ম হয়। নেহাৎ আঁতুড়ের ছেলেটিকে নিজে নাড়াচাড়া করিতে সাহস হইত না, তবে মাস দুমাসের হইতে না হইতেই ভগ্নি শোকাতুর সুদর্শন এই অতি সুন্দর ভাইটিকে তার নিজের বুকে তুলিয়া লইয়াছিল। সে তখন দশ বৎসরের বালক মাত্র। ঘর-বনিয়ার মা তার কোলে দিয়া শিশুকে ধরিয়া রাখিত, নিজে তুলিতে গেলে বকিয়া খুন হইত, কিন্তু এত যত্নে ও সাবধানে সে ভাইটিকে তোলাপাড়া করিত, যে সেও শেষকালে আর বিশেষ আপত্তি করিত না। মা তো প্রথমদিকে তাকে চোখ মেলিয়া দেখিতেনই না, বলিতেন, "ওকে আমি খরচের খাতায় ফেলেই দিয়েছি!" উপরি-উপরি দু'টিকে বিসর্জ্জন দিয়া মন তার নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল। একটু বড় হইতে না হইতেই সুশোভন তার দাদ্দিকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিল।

মরণ পথ যাত্রিনী জননী সুদর্শনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইতেন কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে সুশোভনের কি হইবে,—সে কথা একবারও তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি দৃঢ় নিশ্চয়ে আন্তরিকরূপেই বিশ্বাস করিতেন সুদর্শন বাঁচিয়া থাকিতে তার আদরের ভাইমণিটির পায়ে একটি কুশাঙ্কুরও ফুটিতে দিবে না।

এক্ষণে মুখে সাহস দেখাইয়া ছেলেকে উৎসাহ দিলেন, "একটি ভাল দেখে মাষ্টার রেখে যা, আমি কিছু আর আজই তো নেহাৎ মরছিনে,—তুই মানুষ নাহলে ওকে মানুষ করবি কি করে? আর তা ছাড়া তাঁর অতটাই ইচ্ছে।"

অবশেষে মৃত পিতা এবং মরণোন্মুখী মাতার ইচ্ছারই জয় হইল, সুদর্শন একান্ত অনিচ্ছার সহিতই সুদূর পুণায় ইঞ্জিনীয়ারীং পড়িতে গেল।

দুই

সুদর্শনের মা কিন্তু তাঁর একান্ত ইচ্ছা, চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও সুদর্শনের ইঞ্জিনীয়ারীং পড়া সাঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল মৃত্যুকে কোনমতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ওসব রোগের যেমন নিয়ম, একদিন অকস্মাৎই তাঁকে তাঁর একান্ত ঈপ্সিত অথচ অত্যন্ত অসহ্য রোগযন্ত্রণাপূর্ণ দেহটাকে ধরিয়া রাখিবার বিপুল চেষ্টা হইতে মুক্তি লইতেই হইল। চিকিৎসকদের এবং দেব দেবীদের কাছে আকুল আবেদন নিবেদনের কোন ফলই ফলিল না। সুদর্শনের শিক্ষা সাঙ্গ হওয়ার বাকী দুইটি বৎসর তাঁর সেই রোগ বীভৎস নিঃশক্তি নিঃসার, এদিকে ছেলে দুটির পক্ষে অতীব প্রয়োজন শরীরটাকে ভস্মীভূত হওয়া হইতে রক্ষা করা গেল না। সুদর্শন চারিদিক অন্ধকার দেখিল। এই বালক ভাইটিকে সে আগামী দু' তিন বৎসর কার কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে!

সে ইঞ্জিনীয়ারীং পড়া ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সুশোভনের জন্যেই পারে নাই। অনেক কান্নাকাটি ও যুক্তি তর্কে সেই তাহাকে তার পড়া সম্পূর্ণ করিতে রাজী করিয়াছিল, তাহারই প্রস্তাব মত তাহাকে শান্তিনিকেতনে রাখিয়া সুদর্শন অগত্যা দীর্ঘ তিনটি বৎসরের জন্য পুণায় থাকিয়া তার ইঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষা সমাধা করিল। ভগবানের অসীম কৃপায় ইহার মধ্যে কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ঘটে নাই। সুশোভন সেই বৎসরেই ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর প্রথম দিকের ভিতর থাকিয়া সে একটা স্কলারশিপও পাইয়াছিল।

সুদর্শন প্রথম চাকরী পাইল ঢাকায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঢাকা,—যেখানের

একজন সুবিখ্যাত শাসনকর্ত্তা এক টাকায় আট মণ চাল এই দরিদ্রাদপি দরিদ্র দীন-হীন দেশবাসীকে খাওয়াইয়া আজ পর্য্যন্ত অমর কীর্ত্তিত হইয়া আছেন, সেই ঢাকা! রাম না থাকিলে যেমন রামের অযোধ্যার কোন গৌরবই বর্ত্তমান থাকে না, তেমনই সায়েস্তা খাঁ না থাকায় ঢাকারও আজ সে অতীত গৌরব নাই। শুধু গৌরবই নাই, তা নয়, বরং ইদানীং বহু বৎসর ধরিয়াই তার অগৌরবের কলঙ্ক সমস্ত ভারতবর্ষকে মসিলিপ্ত করিয়া সংবাদপত্র বাহনে তার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্যত্র যতটা না হোক, সাত সমুদ্র পারের যে নিবাসী এ দেশের অভিভাবকদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত এই নিদারুণ বর্ব্বরতা তাঁদের শতাধিক বৎসরের গৌরবোজ্জ্বল বিজয়কেতনকে মসী-লাঞ্ছিত এবং অবনত করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল। ফুলারী যুগে যে বিষ বৃক্ষ বিশেষ করিয়া বাংলার উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হইয়াছিল, এতাবৎকালের সযত্ন সলিল সেচনে সেই চারা গাছ বহু শাখা অশ্বত্থের মতই দিক্-বিদিকে তার শাখা প্রশাখা সকল বিস্তৃত করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মূল হইয়া ভিতরে ভিতরে ফাটল তৈরি করিতেও তার আদৌ বাধে নাই। সহসা একদিন এই ঢাকা শহরেই উহার বড় রকম একটা ধ্বংসকারী শক্তির বহিঃপ্রকাশ হইয়া গেল। হিন্দু-মুসলমানে 'রায়েট' বাধিল। ব্যাপারটাকে ওই বিদেশী শব্দ দ্বারাই চিহ্নিত করা যায়,—সংঘর্ষ সংঘাত—এ জিনিসটা ঠিক নয় তো! ইহা ইচ্ছা-পূর্ব্বক হিন্দু নির্য্যাতনের জন্যই বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এখনও বহুবর্ষব্যাপী ইহারই কালানল সারা ভারতবর্ষে প্রজ্জ্বলিত রহিয়া ইহার সমগ্র অধিবাসী সমেত ইহার প্রায় সমস্ত বড় বড় শহর ও শহরতলীকে ভস্মসাৎ করিতেছে। এই অনির্ব্বাণ অহেতুক বিদ্বেষানলে কত জীবন, কত সম্পত্তি, কত মানীর মান, কত সতীর সতীত্ব, কত শিশুর অস্ফুট জীবনোন্মেষ বিনষ্ট হইয়া গেল তার ইয়ত্তা নাই। কাপালিকের এই অভিচার ক্রিয়ায় এক পক্ষকে অবশ্য ঋত্বিকরূপে বরণ করা হইয়াছে, কিন্তু বলির জন্য নির্ব্বাচিত জীব বিশেষও তো নির্ব্বিকারে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত নয়,

কাজেই ব্যাপারটা প্রথমতঃ যেভাবে আরম্ভ হয়, ঠিক তেমনটি থাকে না। আরম্ভ করে যাহারা, প্রশ্রয় দিয়া সেই মারণযজ্ঞকে পৈশাচিক করিয়া তোলে যাহারা, তাদের সমবেত চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও ব্যাপারটা তখন প্রকৃত 'রায়েট' বা গেরিলা-যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। ইহারও পরে মাস বর্ষ ধরিয়া চলিতে থাকে তীব্র প্রতিহিংসা-সাধন এবং সেটা অবশ্য দুই পক্ষেই। ঢাকা সহরে রীতিমত নাগরিক সভ্যতার ধ্বংস সাধনোৎসব চলিতেছিল। কখনও কখনও ঢিলা পড়িলেও সেই যে কোন অশুভ লগ্নে ব্যাপারটা আরম্ভ হইয়াছে, আজও তার নিবৃত্তি নাই! চাপা আগুন ভিতরে ভিতরে ধূমায়িত হইয়াই আছে, কোন ফাঁকে ঈষৎ একটুখানি হাওয়া বাতাস লাগিলেই হইল। কোন পক্ষই অবশ্য সে সুযোগ ছাড়ে না। প্রতিশোধ স্পৃহা যেমন সেই বর্ব্বর যুগে বা ইউরোপীয় মধ্যযুগে, রাজপুত রাজাদের স্বাধীনতার যুগে পুরুষানুক্রমে জলন্ত হইয়া থাকিত, এই সুউচ্চ সভ্যতাভিমানের দম্ভেরা আধুনিক যুগেও সেই নীতিরই পুনরাবর্ত্তন চলিতেছে। দেখা গেল মানুষ আসলে পশু ব্যতীত আর কিছুই নয়!

সুদর্শন যখন চাকরী পাইয়া নতুন আশালোকে আলোকিত চিত্তমন লইয়া এই শহরে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার হইয়া আসিল, সুশোভনকে এখানের কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া এতদিনকার দারুণ মনঃক্ষোভ বিদূরিত করিল এবং দুই ভাইয়ে মিলিয়া মিশিয়া তাদের ছোট্ট বাসা বাড়ীটিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া সংসার পরিপাটিরূপে পাতিয়া বসিল, তখন কে জানিত সেই ফুটফুটে ছিমছমে বাড়ীখানির তলায় তলায় আগ্নেয় এতবড় একটা গহ্বরের সংস্পর্শ আছে! ছ'মাসও গেল না!—সুশোভনের নিজের হাতে পোঁতা চারা গাছগুলির সবেমাত্র মুকুলোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কলেজের ছাত্রমহলে তার সুন্দর মূর্ত্তি ও সুসভ্য সুনম্র ব্যবহার সে ছেলেকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়াছিল এবং প্রফেসরদের মধ্যেও সে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের একান্ত স্নেহপাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু মুসলমান

সকলেই তাহাকে ভালবাসিতেন। বিশেষ করিয়া তিন বৎসর শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া সুশোভন সাধারণ ছাত্রদের বাহিরের যে শিক্ষাটা তথা হইতে লাভ করিয়া আসিয়াছিল, সেইটাই তার সমস্ত গুণের উপর একটা বাড়তি ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া তাহাকে সমধিক আকর্ষণীয় করিয়াছে। সুদর্শনের সন্ধ্যাটা সুশোভনের কলঝঙ্কারীকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বাছা বাছা গান শুনিয়াই কাটে। যত গান রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক শিখিতে বা মনে রাখিতে এমন জাতিস্মর কেহ নাই, —তবে তার মধ্যের সুনির্ব্বাচিত আনা দুই-তিন অন্ততঃ সুশোভন সেখানের সুদক্ষ শিক্ষকের নিকট হইতে শিখিয়া আসিয়াছে। অবশ্য অতি শিশুকাল হইতেই সে সহজাত সুকণ্ঠের ও সঙ্গীত-প্রিয়তার অধিকারী ছিল। যখন তার ভাল করিয়া কথা ফুটে নাই তখনও সে পাশের বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিয়া শুনিয়া অনেক গানের দুচার কলি কয়িয়া শিখিয়া তোতাপাখীর মত আপন মনে গাহিয়া বেড়াইত। বাপ-মা দাদা ঘর-বনিয়ার মা এমন কি পাড়ার লোকেরাও আসিয়া তার সেই সব অর্দ্ধোচ্চারিত এলোমেলো ভাষার গানগুলি শুনিবার জন্য তাহাকে অনেক তোষামোদ করিত, ঘুষ খাওয়াইত। পড়াপাখীর মত সে যখন আপন মনে,—

"আপুনি যা বাঁকা হহু (হরি) বাঁকা তোমাৎ মন।
ভাদো বাঁকা ছেজ্জেছ তাম্ (শ্যাম) মদন মোওন।
উহু বাঁকা ভুহু বাঁকা, বাঁকা তোমার দু অওন (নয়ন),
মওকেই তুয়া বাঁকা, বাঁকা তোমাৎ ছি চওন (চরন)।"

এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিত, তখন বাক্য বিন্যাসের অদ্ভুত বৈচিত্র্যে যেমন লোকে হাসিয়া খুন হইত, কণ্ঠকাকলীর মাধুর্য্যে তেমনই বিস্মিত হইত। সেই ছেলে অতখানি সুযোগকে কখনও ব্যর্থ হইতে দিতে পারে? সুশোভন সত্যকার একজন সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানে ছাত্রদের একটা ক্লাব ছিল, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ছাত্রেরাই

সেখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত। উন্নতিও এর যথেষ্ট হইতেছিল, কিন্তু যখন হইতে ঢাকা শহর এবং ঢাকা জেলা সরকারী বারুদখানায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন হইতেই এক জাতীয় ছাত্রদেরই দুইটি ধর্ম্ম মতানুবর্ত্তী দুই শাখার ভিতরকার সমস্ত সৌহার্দ্দ বন্ধন খলিয়া পড়িয়াছে। দু'জনদের দুটি সমিতি আধমরা হইয়া কোনরূপে নামরক্ষা করিতেছিল মাত্র,—মান বাঁচাইতে পারে নাই। হঠাৎ উভয় পক্ষই এই চারু দর্শন মিষ্টভাষী, সুধাকণ্ঠি তরুণ ছেলেটিকে কেন্দ্র করিয়া পুনর্ম্মিলিত হইল। স-সমারোহে নতুন সমিতির উদ্বোধন পর্ব্বও ইতিমধ্যে সমাধা হইয়া গেল। এই সমস্ত আয়োজনই সভা পর্ব্বের শান্তিনিকেতনের ছাত্র সুশোভনের রুচি অনুমোদিত ভাবে করা হইল। শান্তিনিকেতনের শিল্প, সেখানের বিশিষ্ট পুষ্পসজ্জা অনাড়ম্বর অথচ আভিজাত্যপূর্ণ দৃশ্যসজ্জায় সুশোভন দর্শকদের নিকট যেন একটি অপূর্ব্বদৃষ্ট পৌরাণিকযুগের অবতারণা করিয়া দিল। গান শিখাইল সুশোভন, গান গাহিল সুশোভন, এমন কি দুইটি ছোট্ট ছেলেকে সাজসজ্জা পরাইয়া মণিপুরী 'বনবীর' নৃত্য শিখাইয়া দর্শকদলকে সে বিমুগ্ধ করিল। এই সভাপর্ব্বের সমাপ্তি সঙ্গীতটি কম-বয়সের ছাত্রদল লইয়া গঠিত।

"তেত্রিশ কোটী মোরা নহি কভু ক্ষীণ
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন॥"

দেখা গেল কোরাসে বহু মুসলিম ছাত্র স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া যোগ দিয়াছে। সুশোভন যেন সেই "বালক বীরের মত এসে" বিদ্বেষ বিচ্ছিন্ন তরুণ দলকে জয় করিয়া লইয়াছে। সবাই বিস্মিত চিত্তে ভাবে "এ ছেলে এতদিন কোথায় ছিল ?"

তিন

সুদর্শন ও সুশোভনকে একত্রে দেখিলে তারা দু'জনে যে এক মায়েব সন্তান এমন মনে হয় না। সুদর্শন বলিষ্ঠ গঠন লম্বা চওড়া আকারের দৃঢ়শরীরী গায়ের রং তার সুশোভনেব মত উজ্জ্বল গৌর নয় অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণই বলা, সহৃদয় সচ্চরিত্র কর্ম্মঠ কর্ত্তব্যপরায়ন এবং সে একান্তরূপেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই দৃঢ়তাই তার চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। যে কোন বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প একবার হইলে তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা কাহারও সাধ্যে নাই। এমন কি অত আদরের ভাই যে সুশোভন, যার চেয়ে বড় এ পৃথিবীতে তার কাছে আর কিছুই নয়, তাহাবও ছিল না। অবশ্য সুশোভন সে কথা ভাল করিয়াই জানিত এবং সেজন্য দাদার কোন সঙ্কল্প স্থির হওয়াব পূর্ব্বেই সে তাহাব উজ্জ্বল চঞ্চল আয়তনেত্র দুটিতে সকরুণ মিনতি ভরিয়া দাদার কাছটিতে আসিয়া বিনত নতমুখে দাঁড়াইত। সুদর্শন যেখানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়, সুশোভনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া একটুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিয়া সস্নেহে প্রশ্ন করিত,—

"কিরে সুশু! কি বলবি?"

"বলছিলুম," বলিয়া সুশোভন হয়ত বা ঈষৎ একটু কুণ্ঠা প্রকাশ করিল। তার মনের ভাব সুদর্শনের অবিদিত নাই, সে পরম স্নেহের ভাইটিকে আদর করিয়া নিকটে অহ্বান করিল, "বল্, আয়না এখানে এসে বোস্। কি বলবি?" পাশের চেয়ারটা দেখাইয়া দিল।

সুশোভন স্মিতমুখে দাদার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া (ধরা যাক্ যেমন) আবদার

জানাইল, "তুমি কংগ্রেসকে চাঁদা দেবে না বললে কেন ?"

সেইদিন কিছুক্ষণ আগেই কংগ্রেস পার্টির লোক ঐ উদ্দেশ্য লইয়া সুদর্শনের কাছে আসে এবং সুদর্শন তাদের বলিয়া দেয় সে সরকারী কর্ম্মচারী, গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে যখন 'ব্যান' করিয়া দিয়াছে, অতএব সে তাদের চাঁদা দিতে পারে না। সুশোভন অবশ্য নিজের নিকট হইতে সামান্য কিছু তাদের হাতে দিয়াছিল, কিন্তু তার নিজস্ব টাকা এমন কিছুই তো বেশী নয়, কতই দিবে ?

সেই পূর্ব্বকথিত কথাই সুদর্শন তাহাকে বলিল।

ইহার উত্তরে সুশোভন প্রশ্ন করিল, "তোমাদের মাইনে কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট থেকে দেয় না ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট। সে টাকা কি ঐ সব লোকেরাই জোগান দিচ্ছে না, যারা বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করবার জন্য স্ট্রাগল করছে ?"

সুদর্শন কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিল, তারপর সহসা মৃদু হাসিয়া সুশোভনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল,—

"দেখিস, নিশ্চয় তুই একদা সুরেন বাঁড়ুয্যে হবি ! আচ্ছা যা এখন—"

সুশোভন স্মিত বিকশিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহারই জয় হইয়াছে।

"হ্যাঁ, শোন, আচ্ছা দাঁড়া একটু—"

সুশোভন মুখখানা একটু কাৎ ভাবে রাখিয়া দাঁড়াইল।

"কই, বললি না তো কত দিতে হবে ?"

সুশোভন এবার হাস্য বিস্ফারিত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে চাহিল, শান্ত কণ্ঠে বলিল, "সে তুমি যেমন দিতে পার।"

সুদর্শন হাসিয়া বিদ্রূপ করিল, "আহা কি বিনয়ী ! চট্ করে বলে ফেল না, দেখি মতলবটা কি ?"

একটু ইতস্তত,—"শ'খানেক কি পারবে না দিতে, খুব দরকার ছিল ওঁদের ?"

রাইটিং টেবিলের চাবি বন্ধ ড্রয়ার খুলিয়া চেকবুক বাহির করিতে করিতে সুদর্শন ব্যঙ্গ-ভরে মন্তব্য করিল, "পারতেই হবে! না পারলে তো তুমি সন্তুষ্ট হতে পারবে না? যা নে—নিয়ে যা, ভাগ্! দরকারী কাজ আছে।"

আবার এমনও হইয়াছে, কোন নিম্নস্থ কর্মচারীর বিশেষ কোন গুরু অপরাধে সুদর্শন তাহাকে পদচ্যুত করা স্থির করিয়াছে, অপরাধী সুশোভনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, এক্ষেত্রে সুশোভন নিজেই সন্দিগ্ধ! তাই সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকিল। এক লহমার দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য বুঝিয়া সুশোভন তার বিশেষ একটা শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কথা কহিল, "খোকা! আমায় কিছু বলো না।"

সুদর্শনের এই কণ্ঠকে সুশোভন চেনে, সে জানে ইহার পর আর কোন তর্ক যুক্তি অনুরোধ অনুনয় চলে না। এক পা এক পা করিয়া সে আস্তে আস্তে করিয়া যায়। "খোকা" সম্বোধনটাও যে দাদা এইসব সময়েই বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাও সে জানে—অর্থাৎ সে যেন উহারই মধ্য দিয়া বলিতে চায়, যতই হও তো তুমি সেদিনের "খোকা", এ সব জরুরী বিষয়ে কথা বলিতে আসা তোমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, অতএব সেটা করিও না।

চার

দুঃখের পর যে সুখ আসে এবং সে সুখ যদি শান্তিকে সাথী করিয়া আনে তার মত ঈপ্সিত মানুষের পক্ষে আর কিছুই নাই, কিন্তু মানুষের ভাগ্যচক্র পৃথিবীর গতির সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্তের সমতালে আবর্ত্তিত না হইতে থাকিয়া যদি ঐখানেই অচল হইয়া থাকিতে পারিত!

তা হয় না, সংসারের চক্রনেমী তার চিরদিনের আবর্ত্তন পথে অবিকল বাঁধা নিয়মে চলিতেই থাকে। ঢাকা সহরে,—অবিশ্রুত বর্গীর উপদ্রব, নাদির শার বা তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণের ছোট সংস্করণে অকস্মাৎ দাঙ্গা, লুট, অগ্নিদাহের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল।

কারফু অর্ডার এবং পাইকারী জরিমানায় সহরবাসীদের উপরন্তু যথারীতি নাজেহাল করিতে করিতে তাদের ধন-প্রাণ-মান সর্ব্বস্বই বিপুলভাবে লুণ্ঠিত হইয়া চলিল; সরকারী তোড়জোড় যতই বাড়ে, উপদ্রব ততই দ্বিগুণ বেগে বাড়িতেই থাকে,—অর্থাৎ চলতি কথায় যেমন বলা হয়, শরীরের স্ফীত অংশে বিস্ফোটকের যন্ত্রণা! দিন-মাস-বর্ষ ধরিয়া পৌরজন সেই নিদারুণ যন্ত্রণা রীতিমত ভোগ করিতে থাকিল। দোষী ধরা পড়ে না, নির্দ্দোষী পথচারী ধৃত হইয়া লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হয়। গুণ্ডা—খুনী একটিও মরে না, মরে উভয় পক্ষের নিরীহ নিরপরাধ শিশু বৃদ্ধ যুবা নারী। উপরন্তু জগতের ইতিহাসে যার তুলনা কমই মিলে, নারীর প্রতি অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার!

মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া সুশোভনের মনে হইল তার ঘরের বাহিরে কাহারা যেন চলাফেরা করিতেছে, ঘর-বনিয়ার মা নয়, শ্যামা চাকরও নয়, পাদ-চারীরা সংখ্যায় অন্ততঃ তিন চার জন। ঈষৎ ভয়ে ভয়েই সে দ্বারের সন্নিহিত হইয়া প্রশ্ন করিল "কে ওখানে?"

অদূর হইতে একটা চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—"বুড়াডা না ছাবালডা আইচে?"

সুশোভন এ প্রশ্নের উত্তরও শুনিল, "ও সাপও যা, সাপের সুলুইও তাই—"

নিষ্ঠুর সন্দেহপূর্ণ সত্যে পর্য্যবসিত হইতে বাকি ছিল না, এক মুহূর্ত্ত অসহায় কিশোর আতঙ্ক রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া থাকিল, ততক্ষণে অস্ফুট নক্ষত্রালোকে দেখা গেল তিনজন লোক তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ফয়জুদ্দিন! তুমি এত রাত্রে কেন?"

যে কর্ম্মচ্যুত অপরাধী কর্ম্মচারীর জন্য সুদর্শনের কাছে দরবার করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল, যার অন্য চাকরী না হওয়া পর্য্যন্ত সুশোভন নিজের হাত-খরচ বন্ধ করিয়া মাসে মাসে দশটি করিয়া টাকা যোগাইয়া যাইতেছে, এ সেই—

সমস্বরে তিনজনেই হাসিয়া উঠিল, সেই ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সেই কর্কশ এবং নৃশংস অর্থপূর্ণ হাস্যধ্বনি একান্ত পৈশাচিক শুনাইল। সুশোভনের বুকের মধ্যে তার তাজা সুস্থ চলন্ত রক্তস্রোত যেন সে হাসির করকা স্পর্শে মুহূর্ত্তে হিম শীতল হইয়া গেল। বুদ্ধিমান ছেলের বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। সে ফয়জুর দিকে ফিরিয়া কোনমতে উচ্চারণ করিল "ফয়জু! তুমি আমাদের ক্ষতি করবে?"

আবার তিনজনে সেই একই হাসি হাসিল, ফয়জু উত্তর করিল, "কেন করব না? তোমার দাদা আমার করেনি?"

সুশোভনের পা কাঁপিতেছিল, গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, তথাপি সে বিপুল বলে নিজেকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতে থাকিয়া কোনমতে বলিতে লাগিল, "তুমি তো নিজে জান, তোমায় বরখাস্ত না করে দাদার উপায় ছিল না, নইলে আমার কথা দাদা ঠেলতেন না, আর সেজন্যে আমি তো তোমাকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করেছি।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক মনে আছে,—আপনাকে আমি কিছু বলব না, কাউকে বলতে দেব না, কিন্তু বড়বাবুকে—" ফয়জুর সঙ্গী দুজন বাধা দিল, "বলিস কি স্যাঙ্গাৎ ও ছোঁড়াডা কাফের না!"

ফয়জু দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—"কাকু ও আমায় ঢের দয়া করেছে।"

সুশোভন ফয়জুর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, "আমার যা কিছু আছে সমস্ত এনে দিচ্ছি, নিয়ে আমার দাদার প্রাণ ভিক্ষা দাও। কেউ জানবে না, এই

নাও আমায় অনেক দামের হীরের আংটি,—সোনার ঘড়ির দামও খুব কম হবে না। টাকা তো বেশী নাই, যা আছে এনে দিচ্ছি, দয়া কর, ক্ষমা কর, ফয়জু! ফয়জু! কথা কও,—তুমি কথা কইছ না কেন?

ফয়জু নত হইয়া সুশোভনকে মাটি হইতে উঠাইতে উদ্যত হইল, "থাক ছোট-বাবু! তোমার আংটি তোমারই আঙ্গুলে মানায়, তোমার জন্যে আমি—"

"আরে আমার সুমুন্দিরে! ঐ হাঁদু হালারে আংটি পরবারে লেগেছো"—এক ঝটকায় আংটিটা কাড়িয়া লইয়া ফয়জুর সাথী সুশোভনের মাথায় একটা লাঠি বসাইয়া দিল, সুশোভন তখন গভীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা! দাদা! ডাকাত দাদা! দাদা! দাদা!"

ফয়জুর দুই দিকের পাঁজর আহতের মস্তক নিঃসৃত শোনিত ধারায় ভিজিয়া গেল। সে ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, করিম ভাই! এ কি করলি রে, কা'রে মারতে এ কাকে মারলি!"

"ওঃ কা'রে মারলি। কেন এ বেটা কি কাফের নয়?"

"ছোট বাবু!—"

সুশোভনের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তথাপি মৃত্যু বলে বলীয়ান বালক আর্ত্ত উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুনঃ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, "দাদা! দাদা! নিজেকে বাঁচাও,—ডাকাত, ডাকাত, দাদা গো!"

পরক্ষণেই শাবলের আঘাতে সুদর্শনের গৃহের রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং আততায়ীদের বিজয়সূচক জাতীয় উন্মাদ জয়ধ্বনিকে ডুবাইয়া দিয়া ভগ্নদ্বার পথে গর্জ্জিয়া উঠিল সংহারাস্ত্রের নির্ম্মম বজ্রধ্বনি,—গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম! গুম!!

পাঁচ

"সুশোভন! সুশোভন! ভাই আমার! দাদা আমার! সোনা ভাইটিরে! সুশো! সুশু! সুশি!" স্বপ্নের মত এইসব ব্যাকুল আহ্বান একান্ত মর্ম্মাহতের আর্ত্তবিলাপের মতই অর্দ্ধ চেতন অর্দ্ধ আচ্ছন্ন সুশোভনের কর্ণকুহরে মনে হয় যেন দিনরাতই বাজিয়া চলিয়াছে। জগতের আর কিছু, অপর কোন ভাল মন্দ কোন কিছুরই অনুভূতি তার সেই মৃত্যুলোকের দ্বার প্রান্তে সমানীত গভীর তমসাচ্ছন্ন অন্তরলোকে প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। অতি দূর দুরান্তর হইতে যেন কোন বহুযুগের অতীত দিনের প্রায়—অচেনা অথচ চির অবিস্মৃত বড় প্রিয় বড আপনার ঐ একটুখানি ক্ষীণ আহ্বানের বেশ, "সুশো! সুশু! মাণিক আমার! ভাইটি আমার! ভাই! ভাই! ভাই!"

শব্দ স্পর্শ রূপ কিছুই তো অবশিষ্ট নাই! জীবন হইতে জীবনের যাহা কিছু সার অংশ সত্য অংশ ইপ্সিত প্রার্থিত পবিত্র পুণ্যভাগ সে তো একেবারে জন্মের মতই নিঃশেষ নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু? কিন্তু, সবই তো তবে এখনও ফুরায় নাই? সবই তো শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই? বাকি কিন্তু যে একটুখানি এখনও আছে? হ্যাঁ আছে, আছে, সে ঐ, ঐ, ঐ—অতীতে পাওয়া অনেক কিছুর মধ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাওয়ার ঈষৎ একটুখানি মাত্র ছায়া স্পর্শ। সে ঐ ফাটা বুকের রক্তধারা,—গভীর মর্ম্মন্তুদ অনিবৃত্ত ক্রন্দনের বেদনা ও সুর? চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া এসরাজের ছেঁড়া তারের মধ্য দিয়া কেমন করিয়া যে বাঁচিয়া আছে আজও ঐ মেঘমল্লারের অশ্রুভারাক্রান্ত সকরুণ অবরুদ্ধ সুরের রেখা।

সুশোভন মরিল না। বাঁচিয়া রহিল বটে; কিন্তু সে এমন বাঁচা, যে একমাত্র সুদর্শন ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন নর কিম্বা নারী তার সে বাঁচার জন্য এতটুকুও আনন্দ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না এবং শুধু তাই নয়, অপ্রকাশ্যে তো বটেই, প্রকাশ্যেও কেহ কেহ সুদর্শনের মুখের উপরেই নির্ম্মমভাবে বলিয়া ফেলিল, "ভগবান একি করলেন! সোনার কার্ত্তিককে কাঠামোসার করে জ্যান্ত মেরে রাখলেন।"

ক্বচিৎ কেহ অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া পরিলেন না, এঁরা আবার এমন কথাও বলিলেন, "এর চেয়ে যে ওর মৃত্যু ভাল ছিল!"

সুদর্শন এদের কোন কথার কোন প্রতিবাদ করিতে পারে নাই বটে, তবে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়, এদের সঙ্গে আর কখনও কোন সংশ্রব না রাখিতে হয় সেই চেষ্টাই সে প্রাণপণে করিয়াছে। অবোধ বালক যেমন করিয়া তার অতি প্রিয় ভাঙ্গা পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া কাঁদে, পরম ভক্ত তার একান্ত ভক্তি-পূজার দেবতাকে বিধর্ম্মীর নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণিত হইতে দেখিলে যে শোনিতাপ্লুত ভগ্নবক্ষে দেবমূর্ত্তির পায়ের তলায় লুটাপুটি খায়, সে তার জগতের সব-শ্রেষ্ঠ গৌরবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমের সেই বিকলাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিরূপ দেহটুকু আগুলিয়া সেই রকম করিয়াই পড়িয়া রহিল। একে সে সহিতেও পারে না, অথচ ইহাকে ছাড়া এক মুহূর্ত্ত দূরে থাকা তার পক্ষে আরও অসহ্য!

"সুশো! সুশো! দাদামণিরে আমার!"

"দাদা!"—

সুদর্শনের সর্ব্বশরীর চমকিয়া উঠিল, "দাদু! দাদু সোনা! তুই কি সত্যিই আমায় ডাকলি? ওরে মাণিক আমার! আবার ডাক।"

"দাদা!"—অতি ক্ষীণ, অতি মৃদু, তবু, তবু, তবু সে তার ভায়ের কণ্ঠ! যে কণ্ঠে এ ডাক এ জন্মে আর বাহির হইতে পারিবে, এমন ভরসা এই জীবনের

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম ছয়টি মাসের মধ্যে অসংখ্য ডাক্তারে দিতে পারেন নাই। না ঢাকায় না কলিকাতায় গুণী জ্ঞানী ফিজিসিয়ান বা সার্জ্জনরা।

ইলেকট্রিক চিকিৎসা দীর্ঘকাল ধরিয়াই চলিল। আশ্চর্য্য ফলও ফলিতে লাগিল, শব্দ স্পর্শ গন্ধগ্রাহী ইন্দ্রিয়রা তাদের অপহৃত শক্তি একে একে ফিরিয়া পাইয়াছিল, কিন্তু সকলের চেয়ে যে শক্তির প্রয়োজনীয়তা অধিকতর, সেই দৃষ্টিশক্তি প্রত্যাবৃত্ত হইল না,—সেকি আর ফিরিবে না তবে? সুশোভন, উঃ সোনার সুশোভন হইবে চির অন্ধ? ভগবান ভগবান!—

নাঃ একেবারেই আশাহীন নয়! যত কমই হোক কিছু আশা আছে? হয়ত বহু চেষ্টায় বহু যত্নে বহু দিনের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সুদীর্ঘ চিকিৎসায় সুপথ্য ও ঐকান্তিক সেবার মধ্যে রাখিতে পারিলে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম উপশিরাগুলিও ক্রমে বল পাইলেও পাইতে পারে। স্নায়ুজাল প্রচণ্ড আঘাতে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, আঘাতটা স্পষ্ট চোখের মধ্যে লাগে নাই, এই যা একটুখানি ভরসা।

তাই হইবে,—সুদর্শন তাই করিবে,—চাকরী সে তো ছাড়িয়াই দিত, নেহাৎ অর্থাভাবে ভাই-এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করায় বাধা পড়িবার ভয়েই ছয়টি মাসের ছুটীর শেষে তাকে চাকরীতে ফিরিতেই হইল, বহু সুপারিশ করিয়া অশেষ চেষ্টা করিয়া সে কলিকাতায় থাকিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল।

সুদর্শনের ভ্রাতৃস্নেহ প্রত্যেক মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমস্ত কলিকাতা শহরে ছড়াইয়া পড়িল। শহরের সমুদয় বড় বড় ডাক্তারকে এখন আর ভিজিট দিয়া ডাকিতে হয় না, তাঁরা নিজেই আসেন, যিনি যতদূর পারেন ও জানেন, কাজ দিয়া উপদেশ দিয়া সম্পন্ন করিয়া যান। প্রতি হপ্তায় এমন কোন নামজাদা ডাক্তার তা' বিধান রায়ই হোন, অমল রায় চৌধুরী বা পঞ্চাননই হোন একটি দিন শতকার্য্যের মধ্য হইতেও না আসিয়া পারেন না। ঐ শয্যালীন শ্বেত পাথরের গ্রীসীয় শিল্পীর নিপুণ হস্ত রচিত ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির মতই অপরূপ বালকটি তাদেরও

বুঝি মনের পাষাণকে গলাইয়া সেখানে একটা স্নেহের মন্দাকিনী বহাইয়া দিয়াছিল।

সুশোভন বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে পারিল। সুদর্শনকে অনেক খোঁজা-খুজির পর একটি ভাল পাড়ায় একটি ভাল ফ্যাট লইয়া উঠিয়া যাইতেই হইল। কেবিন লইয়া আর তো থাকা চলে না তবু তাদের জন্য ওরা বহু অনিয়ম এযাবৎ সহ্য করিয়াছেন অনেক সুযোগ দিয়াছেন,—কিন্তু— এই বারই বড় কঠিন সময় আসিল! বুড়ি ঘর-বনিয়ার মা আজও মরে নাই, কিন্তু প্রায় সে কাজের বার, তা'ছাড়া সে জানেই বা কি? সংসারের রান্না খাওয়াটারই বড় জোর তদ্বিব তদারকই করে। কে এর সমস্ত ভার মাথায় তুলিয়া লইবে? ডাক্তাররা বলেন, তার ভাইয়ের প্রাণ, সেবিকার হাতে এবং সখীর চিত্তে,—কে সে? কোথায় সে?

ছয়

খুঁজিলে এ সংসারে মেলে না কি-ই? সুদর্শন চারিদিক হাতড়াইয়া যাহাকে খুঁজিতেছিল, যার জন্য কলিকাতায় নয় সমুদয় বড় বড় শহর চষিয়া ফেলিতেছিল, বিজ্ঞাপনেও কম টাকা খরচ করে নাই, একদিন প্রভাতে একজন নামজাদা ডাক্তারের পত্র হাতে করিয়া সে নিজে আসিয়া দাঁড়াইল সুদর্শনের ফ্ল্যাটের দ্বারে।

প্রথম কার্ত্তিকের ঈষৎ ভিজা ভিজা সকাল, বাতাসে রাত্রের হিমের একটু আভাস এখনও সূর্য্যের তেজ মুছিয়া লইতে সমর্থ হন নাই, ঠিক পাশেই অল্প একটু ঘাসে ঢাকা জমিতে কতকগুলি ছড়াইয়া পড়া মুক্তার মত শিশিরবিন্দু ফুটিয়া আছে, আর আছে উহারই একটি ধারে একটি নতুন ফলা শিউলি গাছের তলা বিছাইয়া ঝরিয়া পড়া শিশির মাখা শিউলি ফুল।

খোলা জানলার সামনে গদি আঁটা কুসন ঘেরা ইজিচেয়ারে সুদর্শন

সুশোভনকে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে, তার বেশবাস সুপরিচ্ছন্ন, হাতমুখ ধোয়া মোছা, সকালের প্রাতরাশও সমাপ্ত।

শেষ শরতের সোনালী আভা তখনও প্রভাত রৌদ্রের অঙ্গে অঙ্গে বিচ্ছুরিত হইয়া আছে, সেই স্বর্ণোজ্জল আভার একটুখানি সুশোভনের অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণের উপর প্রতিফলিত হইল, সুদর্শন ব্যথা-বিধুরচিত্তে তার সেই ক্লিষ্ট করুণ পাণ্ডুরাভ মুখখানির দিকে চাহিয়া ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিল।

বাঙ্গালী, ছেলের মধ্যে যেমন স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল গোলাপ কান্তি সহজে চোখে পড়ে না,—তেমনই রং ছিল সুশোভনের আর সেই কৃষ্ণ তারকোজ্জল আয়ত নেত্র দুটি!

"দাদা!"

"ভাই!" সুদর্শন খুব নিকটে সরিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া ওর শীর্ণ হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইল,—"দাদুভাই!"

"আমার জন্যে তোমার বড্ড কষ্ট, এর চেয়ে যদি আমি মরে যেতুম সে ঢের ভাল হতো।"

"সুশোভন!" সুদর্শন চমকাইয়া উঠিয়া তার হাত দুটি সবেগে ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন কথা তুমি কি করে বললে?"

সুশোভন ইহার পর অল্পক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, মনের মধ্যের একত্র উত্থিত অনেকগুলি ভাবের আলোড়নে তার দুর্ব্বল বাক্‌শক্তিও তাহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে সমর্থ হইল না, একটু পরে ঈষৎ শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত সে বলিতে আরম্ভ করিল, "আমায় মাপ করো, কিন্তু আমার জন্য তুমি যে কি কষ্ট ভোগ করছো সে কি আমি জানতে পারছিনে? তোমার নিজের জীবন যে তুমি এই একটা অপদার্থ জীবন্মৃতের জন্য ধ্বংস করতে বসেছ, এ আমি—"

"সুশো! সুশো! থামো,—কি বলছ তুমি? তুমি কি জানো না তুমি আমার কি,—আমার কতখানি—আমার, তুমি ছাড়া জগতে কে আছে? কি আছে?"

সুদর্শনের কণ্ঠ অনবরুদ্ধ অশ্রুবাষ্পে জড়াইয়া ক্ষীণ হইয়া আসিল, সে আর্ত্ত ভাবে একটা সুদীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিল, না, না, না, তার তো এমন করিয়া নারীর মত ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না, না,—কিছুতে না! ডাক্তাররা একবাক্যে বলিয়াছেন, উহাকে সহজ ও সানন্দ রাখিতে হইবে, সুদর্শনকে তার অন্তরের সমুদয় হাহাকারকে চাপিয়া রাখিয়া হাসিতে হইবে,—হ্যাঁ হাসিতেই হইবে। এতটুকু উচ্ছ্বাস নয়, ইমোশান তো নয়ই। প্রাণপণে কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে কান্না কি হাসি ঠিক বুঝা যায় না এমনিভাবেই সুদশন কহিয়া উঠিল,—

"রেখে দে তোর পাগলামী! শোন্ একটা কবিতা পড়ি।"

ভাইকে কোন কিছু বলিবাব অবসর না দিয়াই সে খট্ খট্ করিয়া ঘরের বাইরে চলিয়া গেল, সেখান হইতে কি উপায়ে মুখ-চোখের অশ্রুসজল ভাবটাকে কথঞ্চিৎ সুসভ্য করিয়া লইয়া বেশ খানিকক্ষণ পরে একখানা রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

"শোন্ খুব ভাল দেখে একটা পদ্য পড়ি শোন;—বলিতে বলিতে যেখানেই প্রথম খুলিল সেখান হইতে পড়া আরম্ভ করিল;—

"যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে
সব সঙ্গে গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া;
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তিও আসিছে অঙ্গে নামিয়া।"

কিন্তু হায় সুশোভনকে সে ভুলাইবে কি দিয়া? কোন্ ছলভরা অভিনয়ে? সে হাতুড়ি পেটা বিজ্ঞানের ছেলে, কারখানার মজুর, জন্ম হইতেই সেই প্রকৃতি

লইয়া সে এ পৃথিবীতে আসিয়াছে, সে পড়িবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সুশোভনের মন ভুলাইয়া রাখিতে? শিশু সুশোভনের আধো উচ্চারণ হইতে কিশোর তরুণ সুশোভনের অজস্র প্রাইজ পাওয়া অপূর্ব্ব রেসিটেসনের সঙ্গীতময় আবৃত্তি তার দুই কান ভরিয়া গমকে গমকে বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ সে বইখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পড়া বন্ধ করিল।

"আমার হয় না, নারে?"

সুশোভন দাদার কবিতা পড়া শুনিতে শুনিতে মনে মনে একটুখানি যে অস্বস্তিবোধ না করিতেছিল, তা' নয়; কিন্তু ও যে দাদার কণ্ঠ,—ওকে কি আবার হিসাব করিয়া ভাল লাগাইতে হইবে? ওর সঙ্গে এই ভ্রাতৃময়-প্রাণ স্নেহময় জ্যেষ্ঠের যে অগাধ ভালোবাসা মধু-মিশ্রিত অনুপান রহিয়াছে, অভাগা আতুর সুশোভনের কাছে সেই যে মধুরতর! এর চেয়ে মধুস্রাবী যে জগতে তার কানে আর কিছুই নাই, কিছু থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিত নয়।

কিন্তু সুশোভন আজ একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল। সে লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"না, না, না, ও কথা কেন বলছো? আমার তো খুব মিষ্টি লাগছিল!" বরং সে আজ এর উল্টাই বলিল, "ও সব তো তুমি পারো না, তুমি ছিলে চিরদিনের স্পোর্টস্‌ম্যান, আমার জন্যে অনেক দুর্দ্দশাই তো তোমার হোল।"

"অ্যাঃ! কি সব বলিস যে!" সুদর্শন বিব্রত হইয়া উঠিল।

"আচ্ছা তুমি কি আমার জন্যে চিরকাল এমনি সন্ন্যাসী হয়েই থাকবে?"

সুদর্শনের মুখখানা যদিও এ কথায় করুণতায় ব্যাথা কাতর হইয়া উঠিল, তথাপি সে জোর করিয়া অট্টহাস্য করিল;—হাসিতে হাসিতে কহিল,—

"তা নয়!—সন্ন্যাসীই বটে! সন্ন্যাসীরা হ্যাটকোট পরিধান করে, মোটা মাইনের চাকরী করে, মৎস্য মাংস সহযোগে পরিতৃপ্ত আহার করে, খট্টাঙ্গে শুয়ে

নিদ্রা যায়, ব্যাক্-ব্রাস করে চুল আঁচড়ায়, গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ফোঁকে,—

সুশোভনও হাসিয়া ফেলিল। হাসিলে মুখে একদিন মাণিক জ্বলিত, বিদ্যুৎ খেলিত,—আজ তাহা বড়ই করুণ দেখায়, সে হাসি আর তো তার পরিপূর্ণ প্রাণের মধ্য হইতে উৎসারিত ঝর্ণাধারার মত ঝলমলিয়া ঝরিয়া পড়ে না,···বলিল,—

"আমায় ভুলিও না! তোমার কথা আমি ভুলিনি, অহোরাত্রি আমি এই কথাই ভাবছি। ভাবছি, গুণ্ডারা তোমায় প্রাণে মারতে না পারলেও সারাজীবনের মতই আর একদিক দিয়ে মেরে রেখে গেছে! এই একটা অপদার্থ বার্ডেন নিয়ে সমস্ত জীবন ভোর যে কি করে তুমি কাটাবে।"—সুশোভনের আরও হয়তো কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ক্ষীণ স্বর তার শেষের দিকে এত গাঢ় হইয়া আসিল যে, তারপর আর কোন কথা বলিবার শক্তি তার রহিল না। যতখানি নির্ব্বাধে বলিয়া ফেলিবার অবসর সে পাইয়াছে এতটাও সে আশা করে নাই। এসব ধরনের কোন কথার সূচনা করিলেই হয় সুদর্শন উঠিয়া যায় না হয় তো অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তার বলা বন্ধ করিয়া দেয়।

আজ আর সুদর্শন এই দুইয়ের একটাও করিল না, সে বরং এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর শান্ত গম্ভীর স্বরে কহিল, "এ ধারণা তোমার দেখছি যাবার নয়, যে আমি নাকি তোমার জন্যে প্রকাণ্ড বড় একটা 'স্যাক্রিফাইস' করছি! যদি উল্টো হতো তোমার ক্ষেত্রে তুমিও ঠিক এই-ই করতে। সেদিন আমায় বাঁচাতে গিয়েই তো তোমার এই দশা! সে যাক্, ডাক্তারদেরও এই মত এবং তুমি নিজে স্পষ্ট বলতে না পারলেও তাদের দিয়ে প্রত্যহই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ঘটকালী করেই চলেছ! বেশ, সে হলেই যদি তুমি সুখী হও, তৃপ্ত হও, তাই আমি করবো, ওঁদের কাল সেকথা বলে দিয়েছি, আর কাগজেও 'পাত্রী চাই' বলে আজ থেকে চুটিয়ে বিজ্ঞাপন দোব।"

একান্তরূপে হর্ষ বিহ্বল হইয়া উঠিয়াও ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে সুশোভন জিজ্ঞাসা

করিল, "বিজ্ঞাপন!"

নিঃসংশয়িত দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত সুদর্শন উত্তর দিল, বুঝতে পারলিনে,—

"এটা একটা বারগেন্‌রে! যে মেয়ে চিরজীবন ধরে আমার,—হ্যাঁ আমার রোগা বিপন্ন ভাইটিকে সন্তান স্নেহে বুকের মধ্যে অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারবে, তার জন্যে সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে রাজী হবে, সেই মেয়েকেই আমি বিয়ে করবো, তা সে যে বা যাই হোক না কেন।"

সুশোভন তার জগতের এই একটিমাত্র পরমাত্মীয়ের অপরিসীম স্নেহের পরিচয় আজই তো শুধু পাইল না, জ্ঞানের উদয় হইতেই পাইতেছে, কাজেই সে খুব বেশী বিস্মিত বা আনন্দিত হইবার মত নতুন কিছু এ খবরে পাইল না। বরং ভিতরে ভিতরে কি রকম যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিল, 'সে যেই হোক, সে যাই হোক;—এ কি রকম বিয়ে সে করবে? নার্স, দাসী, সেবিকা, জননী, দেবী,—একাধারে সব কিছুকে একেবারে মিলাইয়া বিলিতী ককটেলের মত সে সুশোভনের জন্য মেয়ে সব্যসাচী গড়াইয়া লইবে,—এ কখন মেলে?' এ রকম পনে কেহ কাহাকেও বিবাহ করে? করিলেই কি সেই সর্ত্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করা সম্ভব? তাও এই কৃচ্ছ্র-ব্রত লইবে একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা তরুণী।

ডাকিল, "দাদা!"

উত্তর আসিল, "খোকা! ভাই!"

"ও রকম বিজ্ঞাপন তুমি দিও না দাদা! ভাল ঘরেব সুন্দরী-শিক্ষিতা মেয়ে দেখে বিয়ে করো, সেই আমায় স্নেহ করবে, আমার সাথী হবে, আমার অন্ধ-জীবন ভরিয়ে তুলবে। কেন, পাটনার জজের বি-এ পাশ-করা মেয়ের কথা সেদিন তোমায় ঘটক যে বলছিল, তুমি যে তাকে মার মার করে উঠলে! কেন দাদা এমন করে ভুল পথ নিচ্ছো!"

বাধা দিয়া সুদর্শন বলিয়া উঠিল, "আজও তোকে তাই করবো! ও সব জজ

ম্যাজেষ্টারে চলবে না। ও যা যা আমি ঠিক করে ফেলেছি,—সে ঠিকই করেছি,- ও আর বদলাবে না। তুমি যদি বেশী আপত্তি করো একেবারে বিয়ে বন্ধই করে দোব জেনে কথা কয়ো।"

গট্ গট্ করিয়া হাঁটিয়া সুদর্শন ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল, বুঝা গেল তার সংকল্প কঠিন হইয়া দানা বাঁধিয়া গিয়াছে, এর আর নড়চড় নাই।

সুশোভন হর্ষ-বিষাদে একান্তভাবে ভগবানেব কাছে প্রার্থনা করিল, "আমার জন্যে যেন আমার দাদা অসুখী না হয়, হে ভগবান! ওর স্ত্রী যেন ওর আদর্শে চলতে পারে, আমিও অবশ্য তাকে যতদুর পাবি সাহায্য করবো।"

সাত

সংসারে ফরমাস দিলে কি না মেলে! সুদর্শনের ফবমায়েসী স্ত্রী কেনই বা না মিলিবে? দরখাস্ত তাব হাতে অনেক আসিয়াছিল, সুপারিস পত্র এবং মৌখিক আবেদন-নিবেদনও বড় কমটা আসে নাই। এক রকম লটারী করিয়াই প্রায় চোখ বুজিয়া সুদর্শন তার কনে ঠিক কবিয়া ফেলিল। ঠিক কিছুই করিল না। সব চাইতে বড় একজন ডাক্তারের আত্মীয়াকে তাঁর চোখে দেখিয়া অর্থাৎ চাক্ষুষ না দেখিয়াই তার প্রয়োজনের উপযোগী বোধে তার সঙ্গেই বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিল। মেয়েটি পিতৃহীনা, বিধবা মা কষ্টেই দিনপাত করেন, অনেকগুলি ভাই বোন, এইটি সব্বার বড়। স্কুলে ফ্রি থাকিয়া সে পড়াশুনা ভালই করিয়াছে, গানের গলা সুমিষ্ট, সঙ্গীত শিক্ষায়ও দখল কিছুটা আছে। দেখিতে?—তা শ্যামলা রংয়ের মধ্যে তার রংয়ের বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য আছে, মুখশ্রীটাও নেহাৎ মন্দ নয়।

বিনা আড়ম্বরে একদিন সে আসিয়া এগৃহের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া বসিল। সুশোভন

দাদার হাল ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তারবাবুর সহায়তায় "মল্লির" জন্য তার নিজের পছন্দ মত রংয়ের কয়েকখানা বেনারসী জর্জেট ও মহীশূরী ক্রেপডিসিনের শাড়ী কিনাইল, যুদ্ধের বাজারে তাদের দাম উপকথার মতই অবিশ্বাস্য; তথাপি সুশোভনের মনের অতৃপ্তি ঐটুকুতে যাইতে চাহে না। মনে হয় পূর্ব্ব দৃষ্ট সব কিছু এর জন্য কিনিয়া আনে।

মায়ের সমস্ত বস্ত্রালঙ্কার ঢাকায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাদের স্মৃতি সুশোর মন হইতে যায় নাই। সাদা জামদানী ঢাকাই, বিষ্ণুপুরী ও বাঙ্গালোর চেলীর শাড়ী, শান্তিপুরের ও টাঙ্গাইলের আজকালকার ফ্যাসন মত সব রকমের শাড়ী ও জামার পিস সে একে তাকে ধরিয়া সংগ্রহ করাইল। এসব করিল সে নিজের হাতের টাকা দিয়া,—টাকা সুদর্শন তার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতায় মাস মাস জমা দেয়, যদি তার কোন ইচ্ছা কোনদিন জাগে,—যদি সে সুদর্শনের কাছে সে কথা জানাইতে সঙ্কুচিত হয়।

মল্লির মার অবস্থা তেমন ভালও নয়, আর তা ছাড়া মেয়েকে ফাঁকি দিতে পারিলে সে লোভ সম্বরণ করিতে পারে কজন? হাতে আটগাছি পুরাতন চুড়ি কানে দুটি হাল্কাতম কানপাশা এই লইয়া মল্লি বাড়ী ঢুকিয়াছিল। সুশোভন তার হাত ধরিয়া চুড়িগুলি পরীক্ষা করিল, তারপর মল্লির মাতামহ সম্পর্কিত ডাক্তারবাবুর দ্বারা হাতের গলার কানের মাথার সর্ব্বস্থানের নতুন নতুন ডিজাইনের অলঙ্কার গড়াইতে দিল। মল্লিকে বলিল, "তুমি নিজে পছন্দ করে ডিজাইন বেছে দাও না ভাই—বৌদি!"

মল্লি জীবনে কখনও এত পাওয়া দূরে থাক, চোখেও দেখে নাই। অকস্মাৎ এই প্রাচুর্য্যের ভারে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, ঈষৎ কুণ্ঠাবোধ করিল, অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "একসঙ্গে অত কেন দিচ্ছেন—"

"ফের দিচ্ছেন! তবে আমিও বলি; আপনি, অনুগ্রহপূর্ব্বক চুর-কঙ্কন,

আর্মলেট, ফুল-ঝুমকো আর সোনার সেই কি হার? সরস্বতী-হার, বেশ, নামটি খুব ভাল, তাদের ডিজাইনগুলি ক্যাটালগ থেকে বেছে দিন।"

"যান, আচ্ছা বলবো না, তুমিই বলছি, অত সব গহনার নাম শিখলেন—না না, শিখলে কোথায় শুনি? সুশোভন হাসিল, সেই অশ্রুভরা সকরুণ হাসি, "ঢাকায় থাকতে এক বন্ধুর দাদার বিয়ের ফর্দ্দ আমায় দিয়ে তাঁরা লেখান, আমার হাতের লেখাটা ভাল বলে।

মল্লি একটু সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "দেখেছি খুব ভাল লেখা।" সুশোভন প্রশ্ন করিল, "কি করে দেখলে ভাই?" তার স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

মল্লি কহিল, "তোমার দাদা তোমার সমস্ত জিনিষপত্তর সেই প্রথম দিনেই তো আমায় দেখিয়ে লিষ্ট করে আমার চার্জ্জে দিয়ে দিয়েছেন, এ সমস্তর এতটুকু নষ্ট হলে আমায় তার জন্য খেসারত দিতে হবে।" হি হি করিয়া মল্লি হাসিল, সুশোভনও হাসিল, প্রায় আগের মত প্রাণের রসে সরস হাসি।

"ঠাট্টা করেছেন!"

"ঈশ্ ঠাট্টা! তোমার দাদা ঠাট্টা করতে জানেন নাকি? বাপ্ স্! কি কাটখোট্টা! বিশেষ করে তোমার বিষয়ে যখন কথা কন, এত গম্ভীর হয়ে যান উঃ! কি ভয় যে করে। মনে হয় যেন প্রিভি কাউনসিলের চীফজাষ্টিস্! ফাঁসির আসামীর দণ্ড বাহাল রেখে চরম আদেশ দিচ্ছেন! মানুষ যে এত গম্ভীর হয় আমি ভাবতেই পারতুম না কখনও।"

সুশোভন গভীর লজ্জাবোধ করিতেছিল, কোন কিছু একটা ভাল কথা বলিবার জন্য চারিদিকে সে হাতড়াইয়া সেটাকে কিছুতেই যেন আয়ত্ত করিতে পরিতেছিল না, এমন সময় মল্লি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আর তোমার কথা ছাড়া অন্য কি কথাই বা ক'ন? কাজেই গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মচর্ম্ম ওঁর আর অঙ্গচ্যুত করা হয়েই ওঠে না।" বলিয়া সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, অবশ্য কৌতুক হাস্য নয়, কঠোর শুষ্ক হাস্য। সুশোভন

একান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া আহতস্বরে সহসা ঈষৎ বেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "এ কিন্তু দাদার ভারী অন্যায়! আমার খবরদারী করা ভিন্ন তোমার কি আর সংসারে কোন কিছু কাজ নেই! না, না, আমার জন্যে তুমি এতটা সময় নষ্ট করো না বৌদি, এতে আমার বড্ড লজ্জা করে।" মল্লি আবারও সেই রকমের হাসি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, "লজ্জা করে আর কি করবে বলো। তোমার জন্যে সময় নষ্ট তো আমায় করতেই হবে,—সেই সর্ত্তেই তো আমায় উনি বিয়ে করে এনেছেন, আমিও তো তাতে রাজী হয়ে কনট্রাক্ট সই করে দিয়েছি, এ জন্মটা আমাকে এই রকম করেই তো কাটাতে হবে। যাক্, এখন আমি কি করবো তাই বল? বই পড়বো?—গান গাইবো?"

"আমার মরে যাওয়াই ভাল।"

মল্লি আরও সজোরে একটা বাঁকা হাসি হাসিয়া উঠিল, তার হাসিটা যে আদৌ অকৃত্রিম নয়, সে হাসির স্বর শুনিলেই বুঝিতে তা আটকায় না,—হাসিতে হাসিতে বলিল, "না, না, ঠাকুরপো! ওকথা মুখেও এনো না, মনেও ভেবো না, ওরকম কিছু একটা কাণ্ড ঘটলে সেও তোমার দাদা আমার 'পরেই তার সমস্তটা দায় ভার ফেলবেন।" তারপর একটু আত্মসংবৃত হইয়া ঈষৎ সলজ্জকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "সব বাজে কথা! তার চাইতে একটা গান গাই শোন,—কি গাইবো বলতো? কি? যা হয় একটা গাই।"

সেই ঘরেই টেবিল হার্ম্মোনিয়ম ছিল, সেখানে গিয়া বসিল। তার না ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলার মধ্যের অতি তীক্ষ্ণ হুল ঐ অভাগা অসহায়ের সদা ধিক্কৃত অন্তরেরও অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া কত বড় যে জ্বালা বাড়াইয়া দিয়াছিল, হাল্কা প্রকৃতির নারী তার সমস্তটা না জানিলেও হয়তো সামান্য একটুখানি ছায়া সে তার সহসা বিবর্ণ আনত মুখের উপর খেলিয়া যাইতে দেখিতে পাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি করিয়া যে গানটা মনে পড়িল, কোনরূপ পূর্ব্ব সূচনা না করিয়াই একেবারে

গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—

"নিঠুর হে! এই করেছ ভাল, এই করেছ ভাল,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।"

আঃ তাই বটে! তাই বটে! এমন করিয়াই অগ্নিশুদ্ধি হইতেছে তার, তবে সে দহন তীব্র নয়, সে হইলে তো এতদিনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত! এ তুষানল, এ ধিকি ধিকি জ্বলে, পলে বিপলে অনুক্ষণ দাহ করে, ভস্ম হইয়া নিঃশেষ হইতে দেয় না! নিঠুর! নিঠুর! ওগো নিঠুর! বড় কঠিন প্রাণ তোমার! বড় কঠোর তোমার দণ্ড।

ঘরে ঢুকিল সুদর্শন। কুঞ্চিত ললাট লইয়া ঢুকিয়াছিল, সুশোভনের মুখের দিকে বারেক মাত্র চাহিয়া লইয়া সোজা মল্লিকার পাশে গিয়া দাঁড়াইল; কণ্ঠে তার এতটুকু কোমলতার লেশ মাত্র ছিল না, সুস্পষ্ট আদেশের সুরে কহিল, "বন্ধ করো।"

থমকিয়া মল্লি থামিয়া গেল,—গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও ঈষৎ আর্ত্ত বিস্ময় ধ্বনিতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া নীরব হইল। সুদর্শন ঠিক তেমনিই স্বরে কহিল, "যে গান শুনে সুশো কেঁদে ভাসায়, সে গান গাইবার কি দরকার ছিল? দেশে আর গান ছিল না? ভাল দেখে আর একটা গাও।" বলিয়াই সে যেমন আসিয়াছিল তেমনিই গট্ গট্ করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। আফিসের পোশাক তখনও তার ছাড়া হয় নাই। যদি এতটুকু অপেক্ষা করিয়া একবার চোখ তুলিয়া মল্লির দিকে চাহিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, শুধু শুশোভনেরই নয়, মল্লির চোখ দুটোও শুষ্ক ছিল না।

দাদার এই পুলিসী-জুলুমে সুশোভন লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মের মধ্যে যেন মরিয়া গেল। মল্লিকার জীবনটা সত্য করিয়াই যে এমন জটিল ও অচ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া যাইবে এতটা তো সে ভাবিতে পারে নাই। একথা সত্য যে, সুদর্শনের প্রস্তাবিত সকল সর্ত্তেই সম্মতি দিয়া সে তার পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আর সে সত্যই সুশোভনের

জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত করিয়াছে। তথাপি সেটা যে তাহাকে এমন করিয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠোর ভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতে হইবে তাহা এই সুশ্রী তন্বী শিক্ষিতা মেয়েটি ধারণা করিতে পারে নাই। সুদর্শন তাদের ফুলশয্যার পর দ্বিতীয় রাত্রি হইতেই পূর্ব্ব সর্ত্তানুযায়ী স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করে, আজ এই সুদীর্ঘকালের মধ্যেও একটি দিনও স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্য এতটুকু প্রেমাভাস সে তার সুসংযত নিয়মে বাঁধা ব্যবহারের মধ্য হইতে পায় নাই। সে তাকে 'মল্লি' বলিয়া ডাকে না,—মল্লিকাই বলে। প্রথমটায় সে একবার এ লইয়া আপত্তি তুলিয়াছিল, এখন নিশ্চল আক্ষেপে সহ্যই করে—কিন্তু সহ্যেরও তো মানুষের একটা সীমা আছে?

বসন্তপঞ্চমীতে সুশোভন ভাল ভাল ফুল ও মালা আনাইল, দাদার কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়া মল্লিকে দিয়া বলিল, "তুমি একখানা খুব ভাল দেখে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পছন্দ করে কিনে এনে পরো—বৌদি! আমি ঐ রংটা বড্ড ভালবাসি আর এই কুঁড়ির মালাটা খোঁপায় দাও অন্যটা গলায় পরো।" মল্লির মনটা হঠাৎ বাসন্তী মলয়া নিলস্পর্শিত পুষ্প পেলবের মতই আনন্দের স্পর্শে মৃদু মৃদু হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র হতাশার একটা অবমানিত ব্যথায় তার সেই মনকে কঠোরতর করিয়া দিল, ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে সে বলিয়া বসিল, "তোমার তাতে লাভ? তুমি কি চোখে দেখতে পাবে, আমার সেই বাসন্তী শাড়ীর রংয়ের বাহার? বেলকুঁড়ির করবী ভূষণ, বক্ষ বিলাস?"

বলিয়া ফেলিয়াই ঈষৎ অনুতপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল, সুশোভন তার অন্তর্জ্বালার এই বহ্নি স্ফুলিঙ্গের দাহটুকুকে সহিয়া লইয়া সহজ সহাস্যেই তাকে জবাব দিতেছে, "নাই বা চোখে দেখলুম বৌদি! মনে মনে তো কল্পনা করে নিতেই পারবো। আমার মায়ের ঘরে একখানি সরস্বতী দেবীর ছবি ছিল, তাঁর পরনে ছিল বাসন্তী শাড়ী আর চুলে ছিল জড়ানো মতির মালা। আচ্ছা বৌদি!

তোমার তো মুক্তোর মালা নেই ?—না ? রোস, আমি একটা তোমায় আদায় করে দিচ্ছি ; ও জিনিসটা আমার বড্ড ভাল লাগে। পৌরাণিক সমস্ত দেবীদের গলায় দেখ মুক্তোর মালা আছেই আছে। ও মার্কামারা দেবী বিলাস।"

মল্লির দু' চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। উঃ কি গভীর ভাবেই না এই শিশু-প্রতিম ছেলেটি তাকে ভালবাসে,—আর সে দিনের পর দিন ক্রমশই কি প্রচণ্ড বিদ্বিষ্টাই না তার উপর হইয়া উঠিতেছে! এক এক সময়ে সে একান্ত মনে ভগবানের নিকট এই অর্দ্ধমৃতের মৃত্যু কামনাও যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, না, কি! যেহেতু ওর মরণ ব্যতীত তার নিজের জীবনের এই অদ্ভুত জটিলতার এতটুকু গন্থী ছিন্ন হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সুদর্শন সেদিন তার একটুখানি আত্মবিস্মৃতির আভাস পাওয়া মাত্রেই তাকে লোহার চাবুক মারিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল।

"না আমরা স্বামী-স্ত্রীভাবে থাকতে পারি না, আমাদের সন্তান জন্মালে আমার হতভাগা ভাই-এর উপর থেকে মন আমার সরে যেতেও পারে।"

নারীত্বের সমুদয় মর্যাদাকে নির্ম্মম ভাবে বিসর্জ্জন দিয়া মল্লি বলিয়াছিল, "একটি বিকলাঙ্গ সন্তানই যদি মানুষের থাকে, সে কি আর একটি জন্মালে তাকে ঠেলে ফেলে দেয় ?" সুদর্শন গম্ভীর মুখে প্রত্যুত্তর দেয়, "জানি না কি করে না করে, যা জানি না তার পরীক্ষা দিতে আমি প্রস্তুত নই।"

মল্লির মাসোহারার টাকা বাড়াইয়া দেয়, সুশোভনের আবদার শুনিয়া মুক্তা মালাও বেশ খরচ পত্র করিয়াই কিনিয়া দেয়, সঙ্গে দেয় তার সঙ্গে মিল করিয়া দুটি মুক্তার কঙ্কন এবং কানের মুক্তা গাঁথা থোপা।

মল্লি সুশোভনের হাতে সেগুলি তুলিয়া দিল। নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে সুশোভন বলে, সেই বাসন্তী শাড়ীর সঙ্গে এগুলি পরে তুমি আমায় দেখিও বৌদি! আর গায়ে মেখো চামেলীর এসেন্স, না হয় জুঁই, ও ছাড়া তো আর

কিছু এদের সঙ্গে মিল খাবে না।"

অন্ধকে প্রতারণা করা কঠিন নয়, শুধু আটপৌরে শাড়ীর আঁচলে ফোঁটা কতক এসেন্স ঢালিয়া মল্লি আসিয়া কহিল, হোল তো?"

"সব পরেছ! খুব ভাল দেখাচ্ছে তোমায় বৌদি? আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন তোমায় দেখতে পাচ্ছি! দাদা বাড়ী না ফেরা পর্য্যন্ত কিন্তু কিছু বদল করতে পারবে না—তা কিন্তু আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। তাহলে আমি খুব রাগ করবো।"

আট

১৯৪৬ অব্দের ১৬ই আগষ্ট ডাইরেক্ট-অ্যাকসনের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা কলিকাতার বক্ষ দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। শত শত সহস্র সহস্র নর এবং নারী সেই মরণ-যজ্ঞের বহ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। রক্তস্রোতে রাজপথ হইতে প্রাসাদ-গৃহ ও কুটির পর্য্যন্ত প্লাবিত বিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। উৎসবময়ী মহানগরী মহাশ্মশানে পবিবর্ত্তিত হইতে একটু ও বাকি নাই।

এই রকমই আর এক দানবীয় তাণ্ডবলীলার শিকাররূপে সুশোভন তার উদীয়মান আশা আনন্দময় জীবনকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু সেবারে ঘাতকের খড়্গ বলির পশুকে কাটিতে সমর্থ হয় নাই, বলি বাধিত হইয়াছিল। এবার আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। সুদর্শন টুরে বাহির হইয়া গিয়াছে, দারুণ চিৎকার এবং আর্ত্তনাদের শব্দে আতঙ্কিত হইয়া মল্লি ছুটিয়া আসিয়া সুশোভনকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

ঠাকুরপো! কি হবে ঠাকুরপো! কি করে তুমি বাঁচবে?—

—কি করে আমি বাঁচবো?

এক মুহূর্ত্ত নিদারুণ আশঙ্কায় ও গভীর মনঃক্ষোভে সুশোভন স্তব্ধ অনড় হইয়া রহিল। চকিতের মত তার মনের ভিতর দিয়া এ কথাও বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল,—কি করিয়া সে বাঁচিবে?—আঃ সত্যই কি আজ তার এই পলে পলে মরার এতদিনে সমাপ্তি ঘটিবার কাল আসিল? একদিকে যে দারুণ দুর্দ্দৈব তার জীবনকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে তার স্ফুটনোন্মুখ জীবনের সমুদয় সম্ভাবনা নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া আরও দুইটি জীবনকে সুদ্ধ চির অভিশপ্ত করিতেছে, আজ সেই কি তাকে এই নিরারুণ অভিশাপ হইতে মুক্তি দিতে আসিল। আঃ কি আনন্দ!

কি আনন্দ রে!

কিন্তু একটু পরেই সে অনুভব করিল আরও একটি অসহায় জীব হয়তো তারও চেয়ে অসহায়। সে যে নিরুপায়ে অবশেষে তার মত অসমর্থ অক্ষমকে জড়াইয়া ধরিয়া বেতসপত্রের মত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে,—একে সে কাদের হাতে দিয়া যাইবে? এই নারী-মাংস লুব্ধকদের কবলে? আর সেই হইতে তার মুক্তি?

পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু সতেজে তার দীর্ঘ ঋজু দেহ উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল। নিজের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন নিজেও সে জানিতে পারিল না,—প্রচণ্ড মানসিক শক্তি তার জড় দেহের সমস্ত বাধাকে কি করিয়া যে পরাভূত করিল, সে রহস্য রহস্যই রহিয়া গেল।

দাদার পিস্তলটা আছে?

মল্লি তখনও তেমনিই কাঁপিতেছে, অস্ফুটস্বরে কি বলিল বুঝা গেল না। সুশোভন তাকে দুই হাতে নাড়া দিতে দিতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "বৌদি! পিস্তলটা আনো।"

"ও ঘরে আছে যে!" মল্লি উহাকে ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না।

"এসো আমার সঙ্গে।" সুশোভন ভুলিয়া গিয়াছে সে পঙ্গু। সহজ ভাবেই সে মল্লিকে টানিয়া লইয়া পাশের ঘরে গেল, "কই ? কোথায় ?"

মল্লির সাহস এতক্ষণে একটু যেন ফিরিয়া আসিল। সে ড্রয়ারের মধ্য হইতে পিস্তলটা টানিয়া বাহির করিয়া সুশোভনের হাতে দিল। তার হাত তখনও সেই রকমই কাঁপিতেছে। "ভরা আছে তো ?"

"হ্যাঁ ভরাই আছে।"

সিঁড়ির পথের কোলাহল ক্রমশ উপবে উঠিয়া আসিল। চাকরটার কি হইল কে বলিবে ? আর্ত্তনাদ ও বিজয় হুঙ্কার চাবিদিক হইতেই কানে আসিতেছিল।

"বৌদি তোমার প্রাণ বাঁচাবো না মান বাঁচাবো ?—আমি অন্ধ দুটো তো এক সঙ্গে পাববো না আমি।"

মল্লি দুই হাতে সুশোভনকে সভয়ে জডাইয়া ধবিয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ঠাকুরপো! ঠাকুবপো! আমার জীবনের কোন সাধই তো আজ পর্য্যন্ত মেটেনি, কিন্তু ওরা তো আমায় বাঁচতে দেবেও না !—না, না, তুমি আমায় নিজে হাতে মেরেই ফেলো। তোমার জন্যই আমি এ বাড়ীতে এসেছি, এই স্বামী সন্তানহীন ব্যর্থ জীবন আমাব তোমার হাতেই শেষ হয়ে যাক।"

গৃহদ্বার মুক্তই ছিল, দেখিতে দেখিতে জনস্রোতে ঘর ভরিয়া গেল, ধ্বনি প্রতি-ধ্বনির মধ্যে কর্কশ কণ্ঠে কেহ গাহিয়া উঠিল ;—

"বাঃ ! বাঃ ! 'আকাশে চাঁদ ছেলা রে' !"

"বৌদি ! ঠিক আমার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াও ! একি ! একি ! আমি যে তোমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ! এতদিনে ? এই শেষ সময়ে ?—ওঃ ভগবান ! বড় সাধ হতো যে মুখটি দেখতে,—তাকে আমার অন্ধদৃষ্টির সামনে এমন স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুললে কেন এত বড় অসময়ে ?—আমার হাত যে অবশ হয়ে আসছে ! কি করে ওকে আমি—

"কে? কে?—দাদা! তুমি? এতক্ষণে তুমি এলে?—তবে বৌদিকে তুমি বাঁচাও,—আমি ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, ওকে তুমি ভালবেসো, যত্ন করো। না হলে ওখানে গিয়েও আমি বড্ড দুঃখ পাবো।"

"সুশো! সুশো! সোনার ভাইটি আমার!—তুই সত্যি চলে গেলিরে?"

অভিশপ্তা

ঘটনাটা একটু অদ্ভুত! এমন ঘটনা জগতে যে ঘটে না তা নয়, নাই যদি ঘটে তবে ঘটিল কিরূপে? কথা এই যে এসব ঘটনা বড় একটা সহজে ঘটে না, কদাচিৎ কখনও ঘটিতে শোনা যায়, বিশেষ করিয়া এই রকম একটি কিছু যখন ঘটিয়া যায় সেই সময়েই উদাহরণ স্বরূপ অনুরূপ ব্যাপারেব লোমহর্ষণ বা সেইরকমই কিছু কিছু পর্ব্বকাহিনীর আলোচনা মুখেমুখে লোকে বলিতে থাকে, কিন্তু এর আগের কথা না জানিলে পরের কথাগুলি গুছাইয়া বলা কঠিন হইতে পারে, সেই জন্য বেশ একটুখানি অতীত কথার অবতারণা করিতেই হইবে।

মথুরাপুরের জমিদার সত্যনারায়ণ রায় ইদানীং রাজা খেতাব পাইয়া পূর্ব্ব-পুরুষদের পূর্ব্বনাম বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতিটি তাঁদের প্রজাসাধারণের মনের মধ্যে পুনঃজাগ্রত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য এর জন্য তাকে অনেক কাঠ খড় পোড়াইতে হইয়াছিল। এমনি হয় নাই। তা হোক, পুরাতন নহবৎ ঘড়, হাতিশাল স্থানে স্থানে মজিয়া যাওয়া গড়খাইএর অবশেষরূপে বর্ত্তমান পুষ্করিণীগুলির পূর্ণ সংস্কার সাধন করিয়া তাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান ইত্যাদি বহুরূপ ব্যয়সাধ্য কার্য্যাবলী তাঁহাকে সাধন করিতে হইয়াছিল। খেতাবটি কিনিতেও হাসপাতাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করায় ইহপর উভয় লোকের সংস্থান ঘটিলেও রাজকোষের অবস্থা

এমন ছিল না যাহাতে পুত্র সূর্য্যনারায়ণ তাঁর কুমার পদবী হইতে উন্নীত হইতে পারেন। অবশ্য সময় পাইলে হয়ত তিনিও রাজকীয় মর্য্যাদার অধিকার আদায় করিয়া লইতে না পারিতেন তা' নয়, তবে সে সুযোগ তাঁর ভাগ্যে আর আসিয়া পৌঁছিল না।

বাপের মৃত্যুর সময় সূর্য্যনারায়ণ নাবালক ছিলেন। রাণী দ্রবময়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তা লইয়া পুরাতন দেওয়ানের সাহায্যে বিষয় সম্পত্তি বেশ ভালভাবেই রক্ষা করিতেছিলেন বরং রাজাহীন রাজ্যের অপব্যয়ের অংশটি কম হওয়াতে রাজভাণ্ডার কিছুকিছু পূর্ণও হইতেছিল। এক সন্তান হইলেও সূর্য্যনারায়ণকে তিনি স্নেহের নিগড়ে বাঁধিয়া, তার ইহাকালের সঙ্গে সঙ্গে পরকাল ঝরঝরে করিয়া দেন নাই, বরং এ বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে যে ঘটনা একান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল, বিধবা রাণীর সন্তান সেই অঘটন সংঘটন করিলেন। সূর্য্যনারায়ণ ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হইয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে একটির পর আর একটি পাশ করিয়া গ্র্যাজুয়েট হইয়া তাঁর সমস্ত প্রজাবৃন্দের ও আত্মীয়স্বজনের চিত্তকে বিস্ময়ে চমকিত করিয়া দিলেন। সমস্ত জমিদারীতে এক বৎসরের খাজনা মাপ হইয়া গেল, দেব মন্দিরে, সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে ও মাইনর-স্কুলে বৃত্তি প্রদত্তই শুধু নয়, অপরাপর জন সাধারণ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জমিদার গৃহে ভুরি ভোজনে পরম পরিতৃপ্ত হইল। কাঙ্গালরা এ বাড়ীর বারমাসে তের পার্ব্বনে বরাবরই ভর পেট খাইতে পায়। পুকুরের মাছ তাদের ভোজনপাত্রে কোনদিনও কম পড়ে না। তবে ভিয়ানে তৈরী জিলিপি ও বুঁদিয়া বা মিঠাইটিই তারা পায়। এবারের মত কাঁচা গোল্লা এবং গোলাপ জলে সুবাসিত রসগোল্লার স্বাদ আর কখনও পায় নাই! মুসলমান প্রজারাও এ অঞ্চলে হিন্দুবিদ্বেষী হইতে তখনও শিখে নাই। হিন্দু জমিদারগৃহে তাদেরও একটি হক্ আছে, সে কথাটি উভয় পক্ষেই সমানভাবে জানিত। অশনে-বসনে সকলেই সমানভাবে পুরস্কৃত

হইয়া নবীন প্রভুর দীর্ঘ জীবন ও শ্রী-সোভাগ্য কামনা ঈশ্বর ও খোদাতালার কাছে সমস্বরেই জানাইত, এবারও তারা তাই করিল।

দ্রবময়ীর জীবনের একান্ত সাধনা সফল হইয়াছে। এইবার সূর্য্যের একটি বধূ আনিয়া দিলেই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বৃন্দাবনধামে প্রতিষ্টিত ইষ্টদেব রাধাবিনোদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া দিতে পারিবেন। জীবনের এই একটি মাত্র কাম্য কর্ম্মই তাঁর বাকি। পৌত্রমুখ? তা' সেইখানে বসিয়াই কি দেখা চলে না? ভবিষ্যৎ আগন্তুকের জনক জননীই সেই ঈপ্সিততমকে কোলে করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আনিবে। ব্রজের পবিত্ররজেঃ ধম্বিকৃত শিশুকে পিতামহী "শ্যামনারায়ণ" নামকরণ করিয়া দিবেন।

কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এই আশাটুকু তাঁর পূর্ণ হইল না। অকস্মাৎ তার বৃন্দাবন নয়, তার চাইতে বহুদূর হইতে ডাক আসিল! সুদূরের সহচর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সামান্য কয়েক দিনের মাত্র রোগে ভুগিয়া পরম শুদ্ধাচারিণী মহচ্চরিত্রা রাণী দ্রবময়ী তাঁর নিজগৃহে থাকিয়াই রাধাবিনোদের চির প্রার্থিত পাদপদ্মে স্থান লাভ করিলেন। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া মাতৃবৎসল পুত্র ছলছল নেত্রে অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে মায়ের মুখের কাছে নত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় কি তোমার কিছু বলবার আছে মা? কোন আদেশ করবে কি?"

দ্রবময়ী সহসা যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কি যেন একটি কথা বলিবার জন্য তাঁহার মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ একবারের জন্য ঈষৎ উদ্দীপ্ত দেখাইল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, যে কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে কথা তিনি বলিলেন না, চাপিয়া গেলেন। তারপর মৃদু একটুখানি স্মিত হাস্য তাঁর রক্তশূন্য ওষ্ঠাধরকে অনুরঞ্জিত করিয়া ক্ষণেকের জন্য ফুটিয়া উঠিল, শক্তিশূন্য দক্ষিণ হাতখানি কষ্টে উঠাইয়া শোকস্তম্ভিত সন্তানের নতমস্তকে সংস্থাপন করিয়া ক্ষীণতায় মৃদু হইলেও স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "তোমায় আমার যা দেবার, বলবার, নেবার ছিল সব দেওয়া

নেওয়া হয়ে গেছে ধন! মরণকালে কোন আদেশ দিয়ে তোমায় আমি বেঁধে রেখে যাব না, তুমি বুদ্ধিমান, সংযত চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছেলে, নিজের ভালমন্দ ভেবে চিন্তে নিজেই পথ করে নিতে পারবে।”

এরপর তারকব্রহ্ম রামনাম ছাড়া তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথাই বাহির হয় নাই।

দুই

দ্রবময়ীর মৃত্যুর পূর্ব্বেই সূর্য্যনারায়ণ যখন কলিকাতায় ছিল, কলেজের সহ-পাঠিদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার শুধু মুখের আলাপই নয়, বন্ধুত্বও হইয়াছিল। তার বয়সের ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যটি মোটেই অস্বাভিক নয় সে কথা সকলেই জানেন, মানুষের জীবনের ঐ দিনগুলি, ওব মতন দিন তাদের সারা জীবনের সমুদয় দিনের মধ্যে আর কোন দিনই আসে না। ঐ সময়টিকে তাদের জীবনেব স্বর্ণযুগ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। তা সে হোক না কেন লক্ষপতি কোটিপতি আর হোক না কেন অতি দরিদ্র অথবা অতি মধ্যবিত্তের সন্তান।

এখানের এই সুপবিত্র বিদ্যাধামে ভগবতী বাণীর পবিত্রতম মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একদা তারা প্রত্যেকেই তাদের সমস্ত আভিজাত্য, সমুদয় অহঙ্কার ভুলিয়া যায়। সত্য করিয়াই যেন অনুভব করিতে পায়, তারা প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের জন্য সৃষ্ট, প্রতিজনটিই তার একান্ত আপনার। এদের ভিতরে আবার কেহ কেহ যেন সম্পূর্ণরূপেই এদের অন্তরঙ্গ অন্তরতম হইয়া উঠে।

অচিন্ত্যকুমার অল্পদিনের মধ্যেই সূর্য্যনারায়ণের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠিল, সূর্য্যনারায়ণের সঙ্গে তুলনায় তার অবস্থা আদৌ ভাল নয়, দেশ তাদের সুদূর

বাংলার কোন এক অখ্যাত পল্লীতে। একটি ছোট বোন এবং সে সামান্য ভাবেই দিন কাটায় কলিকাতার এক নগণ্য গলির তুচ্ছ একটি বাড়ীর একটি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া। অথচ দুজনেই তারা কলেজে পড়ে। শুধু অচিন্ত্যই নয়, দেখিতে দেখিতে কাবেরীর সঙ্গেও সূর্য্যনারায়ণের আলাপ পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া গেল। শেষে এমনও দাঁড়াইল যে, একটি দিন কলেজের ছুটির পর অন্ততঃ মিনিট কতকের জন্যও কাবেরী অচিন্ত্যদের বাসায় না ঘুরিয়া আসিতে পারিলে সূর্য্যনারায়ণের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই চোখে অন্ধকার ঠেকিত আর অচিন্ত্য—কাবেরীর বিশেষ করিয়া কাবেরীর তো কথাই নাই, সে দুঃসাহসী মেয়ে এরই ভিতর ঐ অভিজাত বংশীয় সুন্দরকান্তি এবং সুবুদ্ধিমান সুচরিত্র তরুণটি ঘেরিয়া কি যে স্বপ্ন জালে জড়িত হইতেছিল, নিজের জীবনকে লইয়া এরই আশে পাশে মিলাইয়া কি এক ইন্দ্রপুরী রচনা করিতেছিল এবং সেটি যে কি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, সেকথা তখনই ভাল করিয়া জানা গেল, যখন সেই ইন্দ্রসভার অপ্সরা তার জীবনের নৃত্য সভায় চরণ-ক্ষেপের তাল কাটিয়া অভিশপ্তারূপে স্বর্গচ্যুত হইল।

যেমন হইয়া থাকে,—সেই 'ঘৃতকুম্ভ-সমা নারী' পুরুষ-অগ্নির অত্যন্ত সান্নিধ্য হেতু অনেক সময়েই প্রায় মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে, অবশ্য যদি প্রথমাবধিই দুজনের মনে ও মতে বহুল অংশেই মিলন ঘটিয়া যায়, যদি একজনের মধ্যে প্রচুর সহানুভূতি এবং অপরের মনের ভিতর প্রচুরতম দুরাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে। সূর্য্যনারায়ণের মনের ভিতর ভুলিয়াও বন্ধুর ভগ্নীর প্রতি বন্ধুভাব ব্যতীত অন্য কোন ভিন্নভাব বর্ত্তমান ছিল না কিন্তু কাবেরী প্রথম দিন হইতেই এই সুদর্শন যুবকের প্রতি অন্তরের মধ্য হইতেই ভিন্নভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, যতই তার সঙ্গ ও সাহচর্য্য লাভ করিতে লাগিল দিনে দিনে সে আকর্ষণ সূর্য্যমুখীর মত নহে, পৃথিবীর সূর্য্যাকর্ষণের মতই অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিল। সূর্য্যনারায়ণের ঘনিষ্ঠতাকে তার প্রতি ভালোবাসা বলিয়াই সুদৃঢ়ভাবে সে ধরিয়া লইয়াছিল। না লইবেই বা কেন? কাবেরীকে

দেখিতে শুধু ভালোই নয়, বেশ ভাল। সে আই-এ পড়িতেছে, পাসও করিবে, গানের গলা এত ভাল যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একজন গুণী ওস্তাদ যাচিয়া আসিয়া তাহাকে ধ্রুপদ খেয়াল শিখাইয়া যান, শিল্পে সে একজিবিসন হইতে সোনার মেডেল পাইয়াছে। এমন কি তার দুখানা গানের রেকর্ডও বাহির হইয়াছে, কেন সে মথুরাপুর রাজবাড়ীতে রাণী বা বধূরাণী হইবে না? বিশেষ তরুণ রাজকুমার যখন তার জন্মদিনে, নববর্ষে এবং দুর্গাপূজার উপলক্ষ্যে তাকে অত্যন্ত দামী উপহার দিল, ভাল ভাল ফুল মার্কেটে গেলেই সে পায়, সিনেমা দেখাতো প্রতি হপ্তাতেই বাঁধা আছে, তবে? তাছাড়া আরও কারণ আছে :—

পাঁচসাত জন বন্ধুতে মিলিয়া তর্ক হইতেছিল, সূর্য্যনারায়ণ তর্কের ঝোঁকে নিজের ভবিষ্যৎ পত্নীর যে চিত্র অঙ্কিত করিল, সে চিত্র কাবেরীর, উত্তেজনার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বার বার সে গভীর দৃষ্টিতে কাবেরীর উদ্বেলিত বক্ষরক্তের ফেনিলোচ্ছাসে আরক্তিম মুখখানার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, তারপরও কি আর মন বুঝাবুঝির কিছু বাকী থাকে?

অচিন্ত্য অত কথা ভাবে নাই বা এতটা উচ্চ আশাও তার মনের মধ্যে ছিল না। নিঃসহায়া স্নেহের বোনটিকে পড়াশোনা করাইয়া নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দেওয়াই ছিল তার অন্তরের বাসনা। সেকালে যেসব ছেলেমেয়েদের লোকে 'এনার্কিস্ট' বলিয়া সন্দেহ করিত, অচিন্ত্যদের মধ্যে সেই রকম একটি মনোভাবের চিহ্ন প্রকটিত ছিল। দেশের মুক্তির স্বপ্নেই সে বিভোর থাকিত, ইচ্ছা ছিল দুই ভাই-বোনেই এই মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-যুদ্ধের পদাতিক হইবার মত কূর্ম্ম প্রকৃতি এদের দুজনের কাহারও মধ্যেই ছিল না, বিশেষ করিয়া কাবেরীর। তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীব্র অনুভবশক্তি এবং প্রচণ্ড দুঃসাহস এ লইয়া সে বিপ্লব করিতে সমর্থ, ধৈর্য্য ধরিয়া চরকা কাটা অথবা অনুত্তেজিত থাকিয়া পিকেট করা কোনটিই অচিন্ত্যর প্রকৃতি সম্মত নয়। বিধাতা তাকে তেমন করিয়া তৈরীই

করেন নাই। নব-বিধানের সঙ্গে তার মত মিলে না, চোখের বদলে আততায়ীর চক্ষু উৎপাটনবিধিই সে জৈব প্রকৃতি-সম্মত সনাতন বিধি বলিয়া স্বীকার করে এবং সগর্ব্বে তা সর্ব্ব সমক্ষে প্রচার করিতেও দ্বিধা করে না। ভাই-এর এই বৈপ্লবিক মনোভাবের সহজাত অধিকার কাবেরীও যে পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সূর্য্যনারায়ণ কিন্তু এইখানেই তাদের সঙ্গে একমত হইতে পারিল না, যদিও সেকথা সে সাহস করিয়া কোনদিনই প্রকাশ করিতে ভরসা করে নাই। প্রকৃতিগত ভাবেই সে বৈপ্লবিক নয়। পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে সূর্য্যনারায়ণ যেদিন ওদের কাছে বিদায় লইতে আসিল, অচিন্ত্য তখন বাড়ী ছিল না; কাবেরী একাই ছিল। দু' একটি সাধারণ কথাবার্ত্তার পরই সে বলিয়া ফেলিল, "যাবার আগে আমায় একটি জিনিস ভিক্ষা দিয়ে যাবেন ?"

স্যূর্যনারায়ণ একান্ত বিব্রত বোধ করিল, বলিল ; "কি চাই বলো ?" ইদানীং তারা আপনির পরিবর্ত্তে 'তুমি' বলিয়াই কথা বলিত।

কাবেরী বলিল, "আপনার ফটো, না একটি ছোট মিনীয়েচার, যা লকেট করে হারের সঙ্গে গলায় পরা যায়।"

একান্ত বিস্ময়াশ্চর্য্যে প্রায় হতবাক হইয়া গিয়া সূর্য্যনারায়ণ একটু পরে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিল—"আমার ফটো ?"

কাবেরী কহিল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু দেব দেবীদের ছবিই তো লোক গলায় পরে, মায়ের আছে জগদ্ধাত্রীর ছবি।"

কাবেরী অসঙ্কোচে ঘাড় তুলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে সূর্য্যনারায়ণের মুখের দিকে চাহিল, কহিল,—"সকলে তো আর একই দেবতার ভক্ত হয় না, তেত্রিশকোটির দু' একটি বাড়তি হলেও তাঁদের বিন্দুমাত্র স্থানাভাব হবে না।"

সূর্য্যনারায়ণের বাড়ী যাইবার দিন পিছাইয়া গেল, কয়েকটি মাত্র দিন পরে সে

একটি অতি সুন্দর সোনার হারে সুদৃশ্য লকেটের মধ্যে নিজের একটি ছবি আঁকাইয়া কাবেরীকে উপহার প্রদান করিল। কাবেরীর হাতে মোড়কটি দিতে গেল, সে তার কাঁধের উপরকার কাপড় একটু সরাইয়া গলাটি তার দিকে বাড়াইয়া দিল, নিঃসঙ্কোচে আদেশ করিল, "পরিয়ে দাও।"

ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেও সূর্য্যনারায়ণ সেই আদেশ পালন করিল, কাবেরী নত হইয়া তার পদতলে প্রণাম করিতেই সে সশব্যস্তে তাকে ধরিয়া তুলিল, কাবেরীর দুই চোখে জল, সহসা সেই ভরাকুম্ভ উপচাইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে অনাহূত অশ্রুপ্রবাহে তার মুখখানি প্লাবিত হইয়া গেল।

সূর্য্যনারায়ণ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, অথচ কিছু না করিয়া দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া থাকা আরও কঠিন বোধ করিল শুধু তাই নয়, এই নীরব উপাসিকার আকস্মিক আত্মপ্রকাশ তাকে এই কয়দিন ধরিয়া একটি গভীর সংশয়-সঙ্কুলতার মধ্যে আন্দোলিত করিতেছিল, তার মতন একজন তরুণ পুরুষের প্রতি এই তরুণী নারীর এই যে মনোভাব এর অর্থ বুঝিতে না পারার তো কোন উপায়ই নাই,—দিনের আলোর মতই তো সুস্পষ্ট। কেমন করিয়া এক হইয়া গেল কিছুই বুঝা গেল না, সহসা সূর্য্যনারায়ণ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া দেখিল, কাবেরী তার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া অশান্তভাবে রোদন করিতেছে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সূর্য্যনারায়ণ আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, কাবেরীর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিল, তারপর তার সিক্তঅধরে অতি সাবধানে একটি চুম্বনরেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া স্নেহগভীর কণ্ঠে মৃদুস্বরে কহিল, "কেঁদো না কাবেরী, যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো।"

কাবেরী বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত শিহরিয়া সবলে সূর্য্যনারায়ণের দুই হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, ঘোর উত্তেজনায় উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "আসবে? আসবে? বলো, বলো, বলো আমার কাছে ফিরে আসবে?"

বারেক মাত্রই একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়াই সূর্য্যনারায়ণ শান্ত স্বরে উত্তর করিল, "আসবো।"

তারপরই সে আর কোন বিদায়-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত না করিয়াই ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।

কাবেরী কিন্তু বিস্মিত হইল না, আহত হইল না। সস্মিত বিকশিত মুখে জানলার মধ্য দিয়া মনশ্চাঞ্চল্য প্রকটিত-অস্থিরগতি যুবকের যাত্রাপথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিল, তার সমস্ত অবয়ব ব্যাপিয়া নতুন-ফোটা ফুলের মত একটি পরিপূর্ণতা, তার ঈষৎ-রুক্ষ চোখে-মুখে একটি কমনীয় মোহনীয় দীপ্তি যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের যাদুযষ্টির স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তিন

কার্য্যকারণে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য না রাখিয়া কতকগুলো ঘটনা জগতে একান্তই অপ্রত্যাশিতরূপে ঘটিয়া থাকে এবং তাহারাই জগতের সমুদয় বিধিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দেয়। দেশে ফিরিয়া সূর্য্যনারায়ণ কাবেরীর কথা ভাল করিয়া দেখিবার মত অবসর পাইল না। বৃদ্ধ দেওয়ানজী তাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, তার বাপকেও কতকটা। দ্রবময়ী তাঁকে পিতৃ সম্বোধন করেন। সূর্য্যনারায়কে মহলে মহলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইয়া তিনি তার এতদিনকার বৈষয়িক অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিতে না কাটিতে তার বিবাহের কথাবার্ত্তা শুনা যাইতে লাগিল। তখন হঠাৎ তার সেই এক মুহূর্ত্তের একটুখানি অসংযমের স্মৃতি যেটি প্রথম দিকে ঈষৎ একটি গোলাপী স্বপ্নের মতোই স্মৃতির ভাণ্ডারে মাধুর্য্য প্রদান করিয়া

ইদানীং প্রায় চাপা পড়িয়া আসিয়াছিল, তাহা আজ মধুর পরিবর্ত্তে মৌমাছির হুলের মতোই তাহার মনের মধ্যে দংশন করিয়া উঠিল। কাবেরী কি তার বাক্‌দত্তা? সে কি আশা দেয় নাই? যদিও বিশুদ্ধ স্নেহ ব্যতীত তার প্রতি অন্য কোনপ্রকার মনোভাবই তাব মধ্যে স্থান পায় নাই কিন্তু তথাপি তার দিকে—

কাবেরীর খান দুই পত্র আসিয়াছিল। সোনালী স্বপ্নপূর্ণ গভীব ভাবোচ্ছাসে পরিপূরিত তার ভাষা! উত্তরে শান্ত সংযত ভাষায় সংক্ষিপ্ত পত্রই সে পাঠাইল, ভাই যে ভাসায় বোনকে পত্র লেখে সেই ভাষা।

কাবেরীর পত্র দিন দিনই সংযম হারাইতেছে দেখিয়া সে বিপন্ন হইয়া উঠিল, কি কবিবে? মাকে আর না বলা চলে না, মা কি এ বিবাহ সমর্থন করিবেন? কাবেরীবা তাদের সমপর্য্যায়ের ঘর নয়,—

সমস্ত ভাবনার পবিসমাপ্তি করিয়া মা চলিয়া গেলেন। মা শুধুই নন, মায়ের মতন মা! শোকাভিভূত সূর্য্যনারায়ণ পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা হইতে অবসব লইয়া একমাত্র মায়েব চিন্তাতেই আত্মনিমর্জ্জন করিয়া বহিল। মহাসমাবোহে তার মাতৃ-শ্রাদ্ধ সমাধা হইয়া গেল, অচিন্ত্য সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিল, বিশেষ কোন জরুরী কার্য্যের জন্য থাকিতে পারিল না, একদিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলিল, কাবেরী আসিবার জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। অনেক বুঝাইয়া অচিন্ত্যই তাকে আসিতে দেয় নাই। অচিন্ত্য বলিল, "সেটি একটি পাগলী, বলে আমার যাবার রাইট আছে, শোন কথা!"

সূর্য্যনারায়ণ সশঙ্কিত চিত্তে সরিয়া গেল। কাবেরীকে ইদানীং সে ভয় করিতে আরম্ভ করিল নাকি? সূর্য্যনারায়ণের শরীব দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে, মাতৃ-শোক তার মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। দেওয়ান দাদু, তার আশৈশবের দ্বিতীয় অভিভাবক এবং আত্মীয়, জোর করিয়া তাহাকে কাশ্মীরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া গেলেন! ইহার পূর্ব্বে তিনি একটি নীতি বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

যেমন বড় বড় রাজ্য বা সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীরা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। বিশেষ একটি মেয়েলী ছাঁদের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি পত্রের উপর তার একটুখানি সন্দেহ জমিয়া উঠিতেছিল, সাবধানে তার একখানি খুলিয়া ফেলিতেই তার মনে হইল সাপের লেজে পা পড়িয়া গিয়াছে। সে পত্র কাবেরীর বটে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রাবলীর সঙ্গে ঠিক একসুরের নয়, সে লিখিয়াছে,—বন্ধু আমার! সত্যই ভুলে গেলে? একবার দেখা দিলে না? হে সূর্য্য! তোমাব সূর্য্যমুখী যে এইবার শুখাইয়া মরিবে। রহস্য থাক, বড় সঙ্কটে পড়েছি প্রিয়। যদি তোমার কাবেরীকে বাঁচাইতে চাও তবে শীঘ্র এসো। দাদা পুলিশ হাজতে, আমি তাদের হেফাজতে, অনেক কষ্টে এ পত্র পাঠাচ্ছি। সম্ভবতঃ আর লিখতে পারবো না। চার্জ্জ খুবই কঠিন! আমাকেও হয়ত জড়াবে, যা পারো করো।

তোমার কাবেরী—ভগবান! কি রক্ষাই করিয়াছ। এতবড় একটি স্টেটের মালিক ঐ দলের সংশ্রবে পা বাড়াইলে আর রক্ষা আছে! সাত পুরুষের ঐশ্বর্য্য শনির দৃষ্টিতে ভস্ম হইয়া যাইবে না! ডাকবিলির উপর কড়া পাহারা লাগাইয়া কোনমতে ডাকিনী সম্মোহিত বৎসকে দেশছাড়া করিয়া একেবারে ইংরেজ রাজত্বের বাহিরে লইয়া চলিয়া গেলেন, শুধুমাত্র একজন বিশেষ বিশ্বস্ত প্রতিনিধি। সকলেই জানিল উহারা শিমলা পাহাড়ে গেলেন।

সেখানের প্রকৃতির সেই অনবদ্য সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে কে এমন দুভাগ্য আছে যে, তার সেই সম্মোহনশক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে? সূর্য্যনারায়ণ তরুণ যুবক, কল্পনাপ্রবণ, প্রকৃতির স্নেহের দুলাল, কাজেই রূপের উপাসক। সে সর্ব্বান্তঃকরণে এই সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া গেল। বহুদিন সংবাদ না পাইয়া ইদানীং কাবেরীর কথা সে ভুলিতে বসিয়াছিল। কাবেরীকে তার ভালো লাগিয়াছিল কিন্তু কাবেরীকে যে সে ভালো বাসিতে পারে নাই, এই সত্য দিনে দিনেই তার কাছে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাদের দুজনের প্রকৃতির

মধ্যে বিষমতাই যে সে প্রতিবন্ধক সেকথা সূর্য্য জানিত। উগ্র প্রকৃতি, তীব্র ভাবপ্রবন, কাবেরী যে তার ভাই-এর কোন গোপন সাধনার সহায়িকা সে সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় না হোক, ঈষৎ মাত্রায় তার ছিল। তবে কোন কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানের খবর সে জানিত না, তর্কস্থলেই মতবাদের আলোচনাই তার এ বিশ্বাসের ভিত্তি। শান্ত প্রকৃতি সূর্য্যনারায়ণ ছিল মহাত্মা গান্ধীর নবপ্রচারিত অহিংস পন্থী।

এইখানের এই অপর্য্যাপ্ত পুষ্পখচিত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সেবিত শৈল শিখরে জীবন্ত সৌন্দর্য্য প্রতিমা সুস্মিতাকে সে প্রথম দর্শন করিল। মানুষের রূপে যে তরঙ্গ খেলিয়া যায় এবং রূপে ঘর আলো হয়, কাশ্মীর বাসিনীদের দেখিয়া সে কথা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কি সুস্মিতা কাশ্মীরী নহে, কাশ্মীর প্রবাসী বাংগালী কর্ম্মচারীর কন্যা। মা ছিল তার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের মেয়ে।

দেওয়ান দাদু বাধা দিলেন না, এনার্কিস্টের পাল্লায় পড়ার চাইতে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ যথেষ্ট নিরাপদ,—বিবাহ এইখানেই হইয়া গেল। সুস্মিতার মা নাই, বাঙ্গালী বাপের কাছে সে বাংলা ভাষার বিদ্যা ভালরূপেই শিখিয়াছে, আচার ব্যবহার শিক্ষাতেও বিধবা পিসিমা ত্রুটি করেন নাই। বাঙ্গালীর সংসারে কোনদিক দিয়াই সে বেখাপ হইল না। রূপমুগ্ধ তরুণ তার এই নবলব্ধ অতুলনীয় পুরস্কারে পুরাতন কথা যাহা কদাচিৎ কখনও মনের কোণে ঈষৎ কাঁটা ফুটাইত, তাহা সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গেল। কাবেরী নামে কেহ কোথাও ছিল, সেকথাও সে হয়ত আজ আর মনে করিতে পারে না। সুস্মিতাকে নানা বেশে নানা প্রকারে সাজাইয়া তাকে চোখে চোখে রাখিয়া দেয়। তার একমুহূর্ত্তে কাছ ছাড়া হওয়া সে যেন সহ্য করিতে পারে না, ব্যাকুল হইয়া উঠে। সুস্মিতা এই গভীর প্রেম উপলব্ধি করিয়া সুখস্মিত মুখে হাসে, কখনও সহাস্য অনুযোগ করে, "যাও আমি যেন সন্দেশ, পিঁপড়েয় এক্ষুনি খেয়ে ফেলবে।" সূর্য্যনারায়ণ তাহাকে সবলে বুকে চাপিয়া ধরে, অধীর আগ্রহে বলে, "তুমি আমার কাছে থাক।"

সংশয় কি কিছু কোথাও ছিলনা ?

পরম সুখেই দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, অবচেতন মনের মধ্যে অজ্ঞাত ভাষায় ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিয়াছে, খুব ধুম করিয়াই তাদের পুত্র চন্দ্রমোহন বা চাঁদুর শুভ অন্নপ্রাশন পর্ব্ব সমাধা হইয়া গিয়াছে, সুন্দর সুকান্তি শিশুটিকে লইয়া সর্ব্বসুখেরই বুঝি সমন্বয় হইয়াছে। এতটা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এত রূপ এবং এত সুখ কজন মানুষের ভাগ্যে এযাবৎ ঘটিয়াছিল !—

সেদিন বিনা মেঘে সহসা আকাশ হইতে বাজ পড়িল, বহু বহুকাল পরে এক সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা ডাকের চিঠি হাতে পড়িতেই অকস্মাৎ সূর্য্যনারায়ণের বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল, আর সে পত্র পাঠ করিবার পর ? তার চারিধারের পৃথিবী দ্রুততর গতিতে নর্ত্তনতালে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তার পদতলের ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, সে পত্রের লেখিকা কাবেরী—।

"বিশ্বাসঘাতক ! বারম্বার পত্র লিখিয়া ভিক্ষা চাহিয়া তাচ্ছিল্য ব্যতীত কিছুই পাই নাই, কেন তাহা বুঝিলাম। রাজদ্রোহের মামলায় জড়াইয়া অসহায় অবস্থায় আমি ও দাদা যখন জেল খাটিতেছি, তুমি তখন নবপ্রেমের পাত্রী সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছ। উত্তম ! দাদার দীর্ঘ মেয়াদ, কিন্তু আমার ভাগ্যে বিধাতা সদয়, তাই আড়াই বৎসরেই মুক্তিলাভ করিয়াছি। জানিয়া রাখো জমিদার সূর্য্যনারায়ণ ! যত বড়ই তুমি হও, আমার জীবন যে ধ্বংস করিয়াছে, তার নিজের জীবনকে সে অভিসম্পাত হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। সুন্দরী স্ত্রী, সন্তান, বড়সুখে আছে ? না ? এ সুখের বাতি তোমার কতদিন জ্বালিয়ে রাখিতে পারো দেখা যাক্।—কাবেরী।"

মধ্যাহ্নের কখনও কখনও কলঙ্ক রেখা পড়ে, সূর্য্যনারায়ণের সুখ-প্রদীপের দীপ্তছটা সেইদিন হইতেই মিলাইয়া গেল।

তা সেটি এতই সুস্পষ্ট যে সুস্মিতাও অল্প কয়দিনে তার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য

করিয়াছিল। সেই দিন বৈশাখী-সন্ধ্যায় একটি অতি মনোরম পরিবেশ, লতানিয়া যুঁই ফুলের মিষ্ট মধুর গন্ধের সঙ্গে ম্যাগ্নোলিয়া ফুলের মিঠা-কড়া গন্ধ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, কাল বৈশাখীর কোন চিহ্ন সেদিন আকাশের কোন প্রান্তে বর্ত্তমান ছিল না, দক্ষিণা বাতাস স্বামী-সোহাগিনী সুন্দরী বধূর ঈষৎ গোলাপী আভাষযুক্ত শাড়ীখানির অঞ্চলে তেমনই একটি একটি সোহাগের দোলা দিতে দিতে বহিয়া যাইতেছিল, ঠাকুরবাড়ীতে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বৈকালিক উৎসর্গ সমাধা করিয়া ভিতরকার বাগানের বাঁধানো চাতালে সুস্মিতা আসিয়া সূর্য্যনারায়ণের পাশের ডেক চেয়ারখানিতে গা ঢালিয়া দিল। সূর্য্যনারায়ণ তখন এক বিস্মৃত প্রায় অতীত চিন্তায় গাঢ় নিমগ্ন, তার আগমন হয়ত বা জানিতে পারিল না, সুস্মিতা সকৌতুকে তার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মুখেব কাছাকাছি নিজের হাস্যোৎফুল্ল মুখখানি লইয়া গিয়া ছেলে মানুষের মত চাপল্যভবে শব্দ করিয়া উঠিল, "টু।"

নিজের কৌতুকে নিজেই হাসিয়া উঠিল, সূর্য্যনারায়ণ একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিল মাত্র।

সুস্মিতা সাভিমানে তাহাকে ঠেলা মারিয়া বলিল, "যাও।" নিরুত্তর দেখিয়া পুনরুক্তি করিল, "কোন্ তালুকটি তোমার লাটে উঠেছে? কোন্ খাস মহলের প্রজারা ধর্ম্মঘট করলে শুনি? কদিন ধরে তোমার এ হয়েছে কি?"

সূর্য্যনারায়ণ প্রিয়তমাকে বুকের উপর ঈষৎ টানিয়া আনিল, মুখে হাসি ফুটাইতেও গেল, কিন্তু ফুটাইতে সক্ষম হইল না। একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে সে কহিল, "খোকার অন্নপ্রাসনের দিন তুমি বলেছিলে, স্বর্গে যেতে লোক চায় কেন? সেকি আমার এই স্বর্গ সুখের চাইতে কিছু ভাল? আমি যেন জন্ম জন্মান্তর এমনি স্বর্গেই থাকতে পাই। মনে আছে মিতা?"

সুস্মিতা তার বড় বড় কর্ণাভরণ দুইটি সবেগে দুলাইয়া কলস্বরে হাসিয়া উঠিল, "সে তো আজও বলছি, কালও বলবো, পরশুও না বলবার কোনই হেতু নেই।

এর জন্যে এত ভাবনা ?"

সূর্য্যনারায়ণ ঈষৎ ইতস্ততঃ করিল, "কিন্তু যদি এ স্বর্গ তোমার"—ভ্রূভঙ্গি করিয়া সুস্মিতা কোমল শুভ্রকরে তার মুখ চাপিয়া ধরিল, কণ্ঠে শাসনের সুর আনিয়া কহিয়া উঠিল, 'খবরদার! 'যদি' 'কিন্তু' ওসব সন্দিগ্ধ বাক্য-বিন্যাস করেছ তো মার খেয়েছ! আমার স্বর্গ প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত অটুট থাকবে, তুমি যে আমার স্থির জ্যোতি নিখিল ভুবন নেত্র দিবাকর"—

সূর্য্যনারায়ণ অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থা হইতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল, "মিতা! আলোর পিছনে তো ছায়া থাকে, যদি সেই ছায়া রাহুর মত তোমার সুখ-সূর্য্যকে গ্রাস করে! কেন তোমায় আমি বিয়ে করলুম মিতু"

সুস্মিতা তার বুকের উপর প্রবল বেগে ঝাপাইয়া পড়িয়া আদরে আদরে তাহাকে ভরাইয়া দিল।

"কেন আমায় বিয়ে করলে? বুঝতে পারছ না কেন? হিংসুটে। না হলে এত সুখী আমি হতাম কি করে? আমি যে ভাগ্যবতী, আমায় তুমি না নিয়ে কখনো পারো।"

সূর্য্যনারায়ণ গভীর হাতাশার সহিত সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, "অসহ্য! কি সরল তুমি মিতা! তোমায় আমি আর লুকিয়ে রেখে প্রতারিত করতে পারছি না, তুমি আমার এই গভীর সংশয়ে ভরা দুর্ভাগ্য জীবনের সকল রহস্য জেনে আমার এই অসহ্য অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে যদি পারো উপায় বলে দাও।"

সূর্য্যনারায়ণের দিনের বেলায় বসিবার ঘরে একটি কৌচের উপর পাশাপাশি দুজনে আসিয়া বসিল, সুস্মিতার মুখখানি ঈষৎ ম্রিয়মান, সূর্য্যনারারায়ণ চিত্তস্থির করিতেছে, সে ধীর স্থির, ।

সবকথাই সে তাহাকে খুলিয়া বলিল, একমুহূর্ত্তের এতটুকু ক্ষীণ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন ব্যতীত আর কোন অপরাধ তার জীবনে করে নাই, যথার্থই ভগ্নীস্নেহে

অবাধে কাবেরীর সহিত বন্ধুভাবেই মিশিয়াছে। কাবেরীদের মামলার বা দণ্ডপ্রাপ্তির সংবাদ কেন সে পায় নাই, তাহা আজও বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কাবেরীর সর্ব্বশেষ পত্রখানা বাহির করিয়া সে স্বস্মিতার হস্তে প্রদান করিল। সূর্য্যনারায়ণের সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে এতক্ষণ পরে স্বস্মিতার সঙ্কিত চিত্ত তার আশঙ্কিত সন্দেহ বিস্মৃত হইয়া স্মিততর হইয়া উঠিতেছিল, এই পত্র পাঠ শেষ হইবামাত্র তার মুখখানা ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, সে ব্যাকুল বাহুদুইটি আর্ত্তভাবে স্বামীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া আচমকা কি একটি কথা যেন বলিতে গেল, কিন্তু তাব কণ্ঠমধ্য হইতে সেই অর্দ্ধস্ফুট ভাষা স্ফুরিত হইবার পুর্ব্বেই এক অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। বাহিরে একটি গোলমাল ও বহুলোকের পদধ্বনি শ্রুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে দুই হাতে দ্বারের কবাট ঠেলিয়া উন্মাদিনীব মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল খোকার ঝি, "বৌরাণী! রাণী মাগো! তোমার চাঁদমণিকে তার ঠেলা গাড়ী থেকে কে তুলে নিয়ে গেল। সব্বাই বলছে তাকে কেউ জানে না!" স্বস্মিতার কণ্ঠ চিরিয়া বিদীর্ণ বক্ষের রক্তোচ্ছাসের মতই একটি তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত্তনাদ উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বর্গ সুখের অধিকারীনি নারী ছিন্নমূল ব্রততীর মতোই মূর্চ্ছাহতা হইয়া কঠিন প্রস্তরের উপব সশব্দে লুটাইয়া পড়িল।

ঘটনাটি অভূতপুর্ব্ব ও একান্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়া বাড়ীর লোকেরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া নিজেদের মধ্যেই খোঁজাখুজি করিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া এত বড় সাংঘাতিক খবরটি এই নবীনা জননীকে দিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রতিদিনের মতই আজও বিকালে তার 'প্র্যামে' শোয়াইয়া তার ঝি—সে সূর্য্যনারাণকেও একদা লালন করিয়াছিল, সেই বৃদ্ধা খোকাকে লইয়া উদ্যানে হাওয়া খাইতেছিল। রান্নাবাড়ীর দাসী কাছে আসিয়া গল্প জুড়িল, কথায় কথায় বাতের প্রলেপের জন্য হাতীশুড়ের গাছ সে চেনে না বলায় মাত্র পাঁচ মিনিটও নয় খোকার ঝি তাকে দুই রসি দূরে ঐ আগাছাটি চিনাইতে গিয়াছে, ফিরিয়া

আসিয়া দেখে খোকার গাড়ীতে খোকা নাই, বাড়ীর কেহ তাহাকে একা দেখিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছে, এই ভাবিয়া তিরস্কৃত হইবার ভয়ে সে কুণ্ঠিত হইয়া বাড়ী আসিল ও জনে জনে শুধাইল, ফের ফিরিয়া বাগানের মালীদের কাছে দেউড়ীতে দারওয়ানদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া হয়রান হইয়াছে, খোকাকে নাকি কেহ দেখে নাই।

জীবন্মৃতা পুত্রহারা জননীর প্রায় শব্দ স্পর্শ বোধরহিত দেহের উপর নত হইয়া মৃদুকণ্ঠে সূর্য্যনারায়ণ বলিল, "সুস্মিতা! তোমার সুখের সূর্য্য দেখলে তো কত শীঘ্র রাহুগ্রাসে ঢাকা পড়ে গেল। তুমি নিজেকে শক্ত করে নাও, আমি চললুম, যেখান থেকে পারি ওকে আমি ফিরিয়ে আনবো, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করবো না। করতে হয় একা আমিই করবো।"

চার

যে কথা পুত্র শোকাহতা পত্নীর কাছে সুদৃঢ় সংকল্পে বলিয়া গিয়াছিল, সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্য সূর্য্যনারায়ণ চেষ্টাযত্ন অর্থব্যয় বড় কম করে নাই। কলিকাতায় গিয়া অচিন্ত্যদের সংবাদের জন্য, কাবেরীর সন্ধানের জন্য, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন নাই রাত নাই সে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, পুলিশ কমিশনার, ডিটেক্‌টিভ পুলিশ সকলেরই সহায়তা সে লাভ করিয়াছিল। টাকা প্রায় জলের মতই উড়াইল, দেশে বিদেশে ছুটিয়া বেড়াইল, অবশেষে একান্ত ভগ্নহৃদয়ে যখন বাড়ীর দিকে ফিরিতে প্রস্তুত হইল, তখন তার শরীরের সে পূর্ব্ব স্বাস্থ্যের অল্পই বাকি আছে। মনের বল একেবারেই ফুরাইয়াছে। হয়ত তখনও সে ফিরিতে পারিত না, যদি না তখন সুস্মিতার একখানা সকাতর মিনতি ভরা পত্র

পাইত। সে অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছে—

অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয়, চাঁদুকে আর পাইবার কোন আশা নাই, সে আমি বুঝিয়াছি এবং বুঝিয়া ভগবানের এদণ্ড আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তুমি কি আমাকে আরও দণ্ড দিতেছ না? এসো তুমি আমার কাছে ফিরিয়া এস, এমন করিয়া ছুটিয়া বেড়াইলে কেমন করিয়া তুমি বাঁচিবে? আমিই বা বাঁচিব কি করিয়া? এস আমাদের এই নিদারুণ দুঃখ আমরা পরস্পরের মুখ দেখিয়া ভুলিতে, সহ্য করিতে সচেষ্ট হই। সর্ব্বস্ব আমার! তোমার উপরই যে আমার সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তুমি দূরে থাকিলে আর আমি বাঁচিব না, তুমি কাছে এস, ফিরে এসো, আবার আমরা সুখী হইতে চেষ্টা করিব। হয়ত তুমি যাহা সন্দেহ করিতেছ তাহা নয়, হয়ত তার সোনার বালা ও হারের লোভে সাধারণ চোর বাছাকে আমার—উঃ আমি সে ভাবতে পারি না! তুমি শীঘ্র এসো।

তোমার সুস্মিতা।

টেলিগ্রামে খবর পাইয়া স্টেশনে মোটর পাঠাইয়া দিয়া সুস্মিতা তিন মাস পরে নিজের অনাদৃত অঙ্গ সংস্কার করিল। চুলের জটা ছাড়াইয়া চুল বাঁধিল। একটি সাদাসিধার মধ্যে রঙিন শাড়ী বাহির করিয়া পরিল, যে সব খাবার সূর্য্যনারায়ণের প্রিয়, সেই সব জিনিস রাঁধিবার জন্য পাচকদের নির্দ্দেশ দিয়া যতখানি তার পক্ষে সম্ভব, ধৈর্য্য ধরিবার জন্য সচেষ্ট থাকিয়া প্রবেশদ্বারের কাছাকাছি দীর্ঘ কাল পরে স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। সূর্য্যনারায়ণের জন্য প্রেরিত মোটর ছুটিয়া ফিরিল সুস্মিতাকে তাহারই নিকট লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে—হাসপাতালে। ট্রেন কলিসনে একটি মাত্র স্টেশন আগে সদরের হাসপাতালে যে কয়জন আহতকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সূর্য্যনারায়ণ তাহাদের অন্যতম। একেবারে শেষ সময়ের দুটি কথা—

"তার দেওয়া কঠোর অভিশাপ আমি মাথায় করে গেলাম। প্রায়শ্চিত্ত বাকী রইল তোমার কাছে।"

সুস্মিতা শান্ত স্থির অবিচল। অকম্পিত নারী-কণ্ঠ খুব ধীরে উচ্চারণ করিল, "কঠোর তপস্যা-করে বেঁচে থাকবো আমি, এবার যাতে তোমায় পেয়ে আর না হারাই।"

সত্যই সেই যৌবনে যোগিনী মহাতপস্বিনী সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বাঁচিয়াই রহিল। এতবড় রাজবংশের রাজবধূ, সর্ব্বংসহা মূর্ত্তিতে জগদ্ধাত্রীরূপে পরিজন ও প্রজাপালন করিয়া তার দিন কাটিয়া চলিল। সন্ন্যাসের দীক্ষা লইয়া কম্বল শয্যা এবং একবার মাত্র স্বপাকে হবিষান্ন গ্রহণ, সারাদিন ও অর্দ্ধরাত্রি অপরিমিত পরিশ্রম এবং উষালোকে আরাধ্যের উদ্দেশ্যে উপাসনা এই তার নিত্য ব্রত। জনহিতে, দেশহিতে, আর্ত্তসেবায় সূর্য্যনারায়ণের সমস্ত অর্থ নিয়োজিত হইল। দুই পুরুষের একমাত্র বান্ধব লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ দেওয়ান আজও তার নতুন কর্ত্তব্যের বোঝা তেমনই মাথায় তুলিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। যদিও বোঝার ভারে চলৎশক্তি তার এবার রহিত হইয়া আসিল।

পাঁচ

ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, অশীতিপর বয়সে দেওয়ান দাদুর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের অবশিষ্ট একটি মাত্র পৌত্রিকে সঙ্গে লইয়া সুস্মিতা কাশীবাস করিতে-ছিল, শরৎকালে মহাপূজায় একবার সে দেশে যায়, অবশিষ্টকাল গুরুর নির্দ্দিষ্ট সাধনাতে নিবিষ্ট থাকিয়া এখানের ক্ষুদ্র সংসারটুকু পরিচালনা করে। অতবড় সংসারের দায়িত্ব লইয়া সাধনার ব্যাঘাত ঘটে। গুরু বলিয়া গিয়াছেন, তাঁর জীবনের

নব-পর্য্যায় আসিতেছে, এই সময়টি তাকে এই কাশীধামে যতটা সম্ভব সংসার নিরপেক্ষভাবে ধ্যান-ধারণার মধ্যেই থাকিতে হইবে।

জয়ন্তী পিতৃ-মাতৃহীনা হইয়া শৈশব হইতেই স্মিতার কোলে মানুষ হইয়াছে, স্মিতাকে 'মা' বলিতে সে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু স্মিতা তাকে 'মা' বলিতে প্রশ্রয় দেয় নাই বরং বাধা দিয়াছে। বলাইয়াছে 'বাণীমা'। আশ্চর্য্য! এও নাকি গুরুর নির্দ্দেশ। লোকে এবং স্মিতা নিজেও ইহাতে বিস্ময় বোধ করিয়াছে কিন্তু গুরুকে এ লইয়া প্রশ্ন করা সাজে না, হয়ত ভিতরে কোন অর্থ আছে, তিনিই জানেন।

এতদিন জয়ন্তীর সমস্ত শিক্ষাভার স্মিতা নিজের উপরই রাখিয়াছিল, হঠাৎ গুরুদেব লিখিলেন, "পরের মেয়ের লেখা-পড়া নিয়ে দিন কাটালে আমার মেয়ের পড়া যে সাঙ্গ হয় না মা! ওর জন্য একটি মাস্টার রেখে দিয়ে নিজে এইবার অবসর নাও। আমার একটি শিষ্যকে লিখেছি, চেনাজানা একটি ছেলেকে সে তোমার কাছে নিয়ে যাবে।"

বি. এস-সি. ক্লাসের একটি ছেলেকে গুরুভাই সনাতনদা স্মিতার কাছে লইয়া আসিল এবং পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় সে জয়ন্তীর শিক্ষকরূপে বহাল হইয়া গেল। ছেলেটিকে দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনই তার শিষ্ট ব্যবহার, নামটি তার দেবপ্রসাদ। জয়ন্তী ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলে, "ওমা ঐটুকু ছেলের অমন বুড়োর মতন নাম রেখেছে কেন গো?"

স্মিতা হাসিল, "পাগলী! নাম কি ছেলেবেলায় একটা থাকে, বুড়োবেলায় আর একটা বদলায়?"

জয়ন্তী ঈষৎ অপ্রতিভ হইল, স্মিতা দেবপ্রসাদের মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছিল, যে দেবপ্রসাদও তাহা দেখিতে পাইল। সে এই অপরূপ-মূর্ত্তি রাজ-তপস্বিনীর সন্দর্শনে এতই বিমুগ্ধ চিত্রার্পিত হইয়া গিয়াছে

যে, ঐ চমকই তাহাকে চেতাইয়া দিল, ঈষৎ চেষ্টার দ্বারা সুস্মিতা ইতিমধ্যেই তার স্বাভাবিক শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া লইয়া ধীর কণ্ঠে কহিল, "তুমি বলেই কথা বলছি, হিন্দু য়ুনিভারসিটিতে পড়ো, শহর থেকে তো অনেকটাই আসতে হয়, এ বাড়ীতে থাকা কি সম্ভব হবে না ?"

দেবপ্রসাদের মনে হইল এ আহ্বান প্রতিরোধ করা তার পক্ষে যেন অপরাধ, অথচ—না সে তো হয় না। কুণ্ঠিত বচনে সে উত্তর দিল, "মায়ের কাছে থাকবার তো কেউ নেই।"

"ওঃ তবে থাক, আচ্ছা তোমার যেদিন যখন সুবিধা হয় আসবে, সময় কিছু নির্দ্দিষ্ট রাখবার দরকার নেই, সকালে এসে এখানে খেয়ে কলেজ গেলে অসুবিধা হবে কিছু ?"

দেবু আবারও ইতস্ততঃ করিল—"মা যদি মত দেন।"

"ওঃ, হঁ্যা, আচ্ছা যেমন তোমার সুবিধা হয়। আজ থেকেই কি পড়া আরম্ভ হবে ?"

"মা তো জানেন না, দেরী হলে বড্ড ভাববেন।"

সুস্মিতা আস্তে কহিল, "আচ্ছা কাল থেকেই।" সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। একি! কেন সে বারেবারেই এই সদ্য-দেখা অপরিচিত বালককে কাছে টানিতে চাহিতেছে ? এমন তো সে কখন করে না। কেন ওকে তার এত ভালো লাগিল ? এমন চেনা চেনা ঠেকিল ? কার সঙ্গে ওর মুখের আদল আসে ? কার সঙ্গে ? সরিয়া আসিয়া সে উর্দ্ধমুখে প্রাচীরের বিলম্বিত সূর্য্যনারায়ণের চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইল। একি! এ কেমন করিয়া হয়!

জয়ন্বরীকে সকলে দেবুর মা বলিয়া বলে, শুধু তার প্রতিষ্ঠা করা মিডল প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের রেজেষ্টারীতে তার আসল নামটি খেলা আছে। এই স্কুলের জন্য কঠোর পরিশ্রম সে করিয়াছে, সামান্য চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া

মাত্র গুটিকয়েক মেয়ে লইয়া প্রায় পনের বৎসর পূর্ব্বে সে এই স্কুলটি স্থাপন করিয়াছে এবং কি প্রাণান্ত পরিশ্রমে এটিকে একহাতে এবং অন্য হাতে তার একমাত্র শিশুপুত্রটিকে জিয়াইয়া রাখিয়া চলিয়াছে। সে যাহারা চোখে দেখিয়াছে তাহারা তাহার দৃঢ়তা ও শক্তির প্রশংসা না করিয়া পারে নাই, ছেলেটিও ছেলের মত ছেলে, সতের বৎসর পূর্ণ হয় নাই সায়েন্স কলেজের থার্ড ইয়ারে সে পড়িতেছে, রীতিমত স্পোর্ট্‌সম্যান, সুন্দর ও সুচরিত্র, মহাত্মার নির্দ্দেশে সে প্রত্যহ সূতা কাটে, খাদি প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশে খদ্দর বেচে, লাঠি ঘুরাইয়া গুণ্ডা বিতারনেও সে অদক্ষ নয়। এই ছেলে লইয়াই অকাল বার্দ্ধ্যক্য নমিতাঙ্গী অমিত পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত জননী ভূমিতে স্বর্গ রচনা করিতে করিতে বাঁচিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলেই বুঝা যায় সে ঘোর অসুখী, কোন একটি গভীরতর গোপন সংশয়ে দিনরাত তার প্রাণের ভিতর যেন দেবাসুরের মহাযুদ্ধ চলিতেছে।

দেবু আসিয়া হাসিমুখে জানাইল সে পঞ্চাশ টাকার টিউশানি পাইয়াছে, এবার মা একটি শিক্ষয়ত্রী মাহিনা দিয়া ঠিক করুন ও নিজে একটু বিশ্রাম নিন। জয়ঙ্করী এ সংবাদে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিল না, শুধু বলিল, "তোমার পরীক্ষাটা হয়ে গেলে একেবারেই বিশ্রাম নেবো, এখন না।"

তার গলার স্বর নীরস।

দেবু মাকে যত ভালোবাসে ততই ভয় করে, মুখের ওপর তর্ক সে করিতে পারে না, অগত্যা মানিয়া লইতেই হইল।

এদিকে বৎসর কাটিয়া আসিল, দেবুর বি. এস-সি. পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, পরীক্ষার পূর্ব্বে সে তিন মাসের জন্য ছুটি লইয়াছিল। ছুটি সে চাহিয়া লয় নাই। না চাহিতেই পাইয়াছিল। রাণীমা বলিয়াছেন, পরীক্ষার পর দুবেলা পড়াইয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলেই হইবে, দেবু সানন্দে তাহাই করিতেছে।

প্রত্যহ ফিরিয়া আসিয়া দেবু মার কাছে বসিয়া উহাদের সম্বন্ধে কত কথাই না

বলিত। কথা সবই প্রায় অত্যাশ্চর্য্য মহীয়সী রাণীমার বিষয়েই। পুরাণের দেবীদের মত রূপ, গুণ, বিদ্যা ও সকলজনের প্রতি কি অগাধ তার স্নেহ। কত খাদ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করেন, ছোট বড় কত লোক খায়, দেবুকে কত যত্নে খাওয়ায়। তা ছাড়া বার ব্রত উপলক্ষে পূজাপার্ব্বনে দেবু যে সব উপহার পায়, সে সব গ্রহণ করিতে লজ্জায় সে যেন মরিয়া যায়, অথচ প্রত্যাখান করিতেও পারে না, বড় বাধে। যে মার তেজস্বিত্ব আশৈশবে দেবুর সুবিদিত, সেই মা প্রথম দিনেই বলিয়া বসিলেন, "তা ওর কাছে তুমি নিতে পারো, দোষ নেই, অত ভালোবাসে।"

রাণীমাকে চোখে না দেখিলেও কি লোকে তাঁর প্রভাব এড়াইতে পারে না কি?

সে দিন ফিরিতে বেশ একটু বিলম্ব ঘটিল, জয়ঙ্করী অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মেঘ মেদুর আকাশের প্রতি উৎসুক নেত্রে পুনঃপুন চাহিতেছিল, দেবু ঘরে ঢুকিয়াই ডাকিয়া উঠিল, "মাগো।"

"বাপি!" জয়ঙ্করী ত্র্যস্তে উঠিয়া কাছে আসিল। "খেয়ে এলি নাকিরে?"

"হ্যাঁ মাগো! বড্ড দোষ করেছি! বলতে ভুলে গেছলুম আজ আমার ওদের বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, রাণীমার স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ ছিল কিনা! কিন্তু সে কথা থাক—তোমার গলার হারটি একবাব আমায় খুলে দাও তো মা, দেখি।"

হার খুলাইয়া বার বারই সে তার অদেখা বাবার ফটোটুকু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে ভালোবাসিত। তাই ঈষৎ হাসিয়া মা তার হাতে গলার সরু হারটুকু প্রদান করিলেন। একবার লকেটে গাঁথা ফটোর দিকে চাহিয়াই আজ দেবু অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, মা, একি মা? আজ যার শ্রাদ্ধ হলো সেই শ্রাদ্ধবাসরে যে এনলার্জ করা ফটো সাজিয়েছিল, এও তো ঠিক সেই ছবি! গায়ের পোশাক পর্য্যন্ত সেই একই! এ কি করে হলো!"

জয়ঙ্করীর মুখ মৃতের মতো পাংশু হইয়া গেল, কোন মতে শ্বাস টানিয়া সে

একটি শব্দ করিল, "দেবু!"

দেবু সবেগে মাথা নাড়িয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিয়া উঠিল, "ভুল নয়, ভুল নয়, এই ফটো, সেই মথুরাপুরের কুমার সাহেবেরই এই ফটো,—ঠিক এই—"

তড়িৎ স্পর্শের মতোই চমকিয়া আর্ত্তনাদের স্বরে জয়ঙ্করী কহিয়া উঠিল,—"মথুরাপুরের কুমার সূর্য্যনারায়ণ রায়, তার শ্রাদ্ধ! না, না, দেবু! তুমি ভুল করেছে, তার না, তার বাপের শ্রাদ্ধ বোধ হয়!"

দেবু এবার হাসিল, "মা পাগল!" রাণীমার স্বামী যিনি, নাম তাঁরই সূর্য্যনারায়ণ রায়, আর তাঁরই শ্রাদ্ধ! একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক অন্যকে বলছিলেন, "ওর পরিণাম নাকি খুব দুঃখের হয়েছিল, সেই থেকেই রাণীমা একেবারেই সর্ব্বত্যাগিনী। একটি শিশুপুত্র ওর চুরি যায়, সেই হারানো ছেলের জন্য তিন চার মাস সারা দেশ তোলপার করে, বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও কোনো সন্ধান করতে না পেরে কুমাব বাড়ী ফিরছিলেন, সেই সময় ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়—"

"দেবু, দেবু! কি সব গাঁজাখুরি গল্প বলছিস তুই? না, না, তারা খুব সুখে আছে, কত ছেলেপিলেয় তাদের সোনার সংসার জল জল করছে, আমার মত একটি শিবরাত্রের সলতে কেন তাদের হতে যাবে! তারা ভাগ্যবান!"

জয়ঙ্করী উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধশ্বাসে হাঁ করিয়া হাঁফাইতে লাগিল। তার দুই চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

ভীত হইয়া দেবু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইতে গেল, "মা! মা! ওমা! কি হলো মা? কেন অমন করছো? কি হলো মা?"

জয়ঙ্করী ঝটকা মারিয়া ছেলের হাতের মধ্যে হইতে হাত টানিয়া লইল, জোর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়া অস্বাভিক উচ্চকণ্ঠে কহিল, "আগে তুই বল ও সব বাজে কথা! ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়নি, সূর্য্যনারায়ণ রায়

মরেনি, বল শিগ্‌গির ও যদি তার তিনমাস পরেই মরলো,—তাহলে তুই পড়াচ্ছিস কাকে ? সে মেয়েটি তবে কার ? তোর রাণীমার নয় ?"

বিস্ময়ে প্রায় বিমূঢ় দেবু কহিল, "না ওঁর দেওয়ানের নাতনী !"

"তাহলে সূর্য্যনারায়ণ বেঁচে নাই ? ষোল বৎসর আগেই সে মারা গেছে ?" জয়ঙ্করী দাঁতে দাঁত দিয়া প্রাণপণে চাপিয়া ধরিল, দুই হাত তার কঠিনভাবে মুঠি বাঁধিয়া গেল, তথাপি সে ক্ষণমাত্র পরে ভয়-বিহ্বল দেবুর চোখের উপর দিয়াই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া মাথায় গায়ে আঁচল টানিয়া প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বিকৃতস্বরে কথা কহিল—"দেবু ! আমায় এক্ষুণি ওদের বাড়ী নিয়ে চল।"

"সে কি মা"—দেবুর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া গেল। এমন অদ্ভুত চলচিত্ততা সে মার দেখে নাই।

"আমি বলছি আমায় নিয়ে চল্, আমি যাবোই।"

দেবু কহিল,—"তাহলে কাল নিয়ে যাবো। আজ এই রাত্রে, মেঘ বাড়ছে, বিদ্যুৎ হচ্ছে, দেখছো না।"

কি এক রহস্যপূর্ণ হাস্যভরে জয়ঙ্করীর পেশী-দৃঢ় মুখের গাম্ভীর্য্যকে অধিকতর প্রকটিত করিয়া ধরিল, সে হাসি আদৌ হাসি নয়। সে উত্তর করিল, "ওরে, আমার গায়ে তোর মত বনেদি রক্ত নেই। কোনদিন কোন সময়ে কোনখানে যেতে ভয় আমি পাইনি, যখনি যা মনে করেছি, এগিয়ে গেছি, পিছোয়নি। তুই না যাস আমি একাই যাবো, না তুইও যাবি আমার সঙ্গে।"

বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্কা হইতে নামিয়া দুর্গাকুণ্ড রোডের প্রাসাদভবনে যখন তাহারা প্রবেশ করিল, রাত্রি তখন প্রহরাতিক্রম করিয়াছে।

দ্বারবান মাস্টার সাহেবকে ঈষৎ বিস্ময়ে নীরবেই সেলাম ঠুকিল, একজন ভৃত্য পাশে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "এমন সময় ?"

জয়ঙ্করী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়াই সোজা অগ্রসর হইয়া চলিল, যেন

এ ঘরদোর সবই তার চিরপরিচিত, যেন এখানে অনাহূত সে আসে নাই, যেন এখানে ইচ্ছামত আসিবার ফিরিবার তার সম্পূর্ণরূপেই অধিকার আছে।

আলোকজ্জ্বল বড় হলে ঢুকিতেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুষ্পমাল্যে সুভূষিত সূর্য্যনারায়ণের সুবৃহৎ ফটোচিত্র। মুখের উপর তার পাঁচ শত পাওয়ারের বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিফলিত হইতেছিল, চোখ পড়িবামাত্র জয়ঙ্করীর গতিবেগ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া পরক্ষণে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তীরের মতো বেগে সেইদিকে ছুটিয়া আসিল। তার বিস্ময়াশ্চর্য্যে হতবুদ্ধি একমাত্র সন্তানকে বিমূঢ়তর করিয়া দিয়া সেই জীবন্তবৎ প্রতীয়মান জীবনহীন মানব-প্রতীকের পাদমূলে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া যন্ত্রনার্ত্ত বুকফাটা বিলাপ রবে বলিয়া উঠিল, "ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ওগো আমার দেবতা। ওগো আমার জীবন সর্ব্বস্ব, ওগো আমার পাষাণ! একি নির্ম্মম প্রতিশোধ আমার 'পরে নিলে। আঁ্যা, জয় আমার মোটেই হয়নি, তুমিই হয়েছ জয়ী! আমি ক্লেদাক্ত কলঙ্কিত চির অভিশপ্ত হয়ে রইলুম—"

সুস্মিতা এই অসময়ের অতিথিদের আগমন সংবাদ পাইয়া আসিয়াছিল, ঘরে ঢুকিতেই এই হৃদয় বিদারক কান্না ও তাহার মধ্যের নিহিতার্থ এক মুহূর্ত্তের চেয়ে হৃদয়ঙ্গম করিতে তার বিলম্ব হয় নাই। অতি স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য তার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল, সে শান্ত দুটি চোখ তুলিয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ স্নেহ উথলিত দৃষ্টি দিয়া অদূরস্থ লজ্জাভিভূতা কিশোরের অরুণবর্ণ মুখখানি বারেকমাত্র তৃপ্তচিত্তে নিরীক্ষণ করিল, তার পর ধীরে পদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া গভীর সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ঠকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি! কাবেরী দিদি!"

চমকিয়া জয়ঙ্করী তার শতধারা ধৌত শীর্ণ মুখখানা সম্বোধনকারিনীর দিকে ফিরাইল, সত্বর অথচ কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল, তার মুখ দিয়া বহির্গত হইল, "তুমি,-আপনিই সুস্মিতা?"

"আজ্ঞে হ্যা"—সুস্মিতা কাবেরীর হাত ধরিল, "আসুন এইখানে আমরা বসি।"

কাবেরী তার হাত টানিয়া লইল, আর্ত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁয়োনো তুমি, আমরা অভিশপ্তর বংশ, বাপ মরেছেন হিন্দু-মুসলমান রায়েটে। ভাই মরেছে বন্দীশালায় পুলিসের গুলীতে, স্বামী—হ্যাঁ আমার স্বামী,—তোমার স্বামী, হ্যাঁ তাঁকে আমিই মেরেছি। আর তোমাকেও সেই সঙ্গে—" সে আবার বাঁধ ভাঙ্গা তরঙ্গের মতই চিত্র পাদমূলে লুটাইয়া পড়িল।

সুস্মিতা তাহাকে কাঁদিয়া শান্ত হইতে দিয়া, কিছু পরে নত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, "দিদি! ছেলে তোমার অবাক হয়ে গেছে, ধৈর্য্য ধরো ভাই।"

কাবেরী হঠাৎ কঠিন হইয়া উঠিয়া বসিল, কঠিন হইয়া কহিল; ঠিক বলেছ, সে অবাক হয়েই গেছে।

দেবু! কাছে এস, এই ইনিই তোমার সত্যিকারের মা। আমি, আমি,—আমি তোমার কেউ নই—কেউ নই—একটা ছেলে চোর। এদের দণ্ড দিতে শৈশবে তোমায় চুরি করে নিয়ে গিয়ে শেষে তোমার মায়ায় জড়িয়ে পড়ি। তখন ভেবেছিলুম, ওদের এক গেছে, আরও কত হবে, আমার কি আছে। তোমায় আমি বড় করবো, মানুষ করবো, তোমার সমুদয় ক্ষতিপূরণ করবো সেই মনুষ্যত্বের মহত্তর শিক্ষা দিয়ে—"

সুস্মিতার দৃঢ়সংবদ্ধ আবেষ্টন হইতে যখন চন্দ্রমোহন মুখ তুলিল, কাবেরীকে সে ঘরে দেখিতে পাইল না। ছুটিয়া সে বাহিরে আসিল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা! মা! মাগো!"—বাহিরে তখন ঘোর রোলে বৃষ্টি চলিতেছে।

বিবাহে সমারোহ যেমন করিতে হয় তাঁর অনুকূল কিছুরই প্রায় ত্রুটি করেন নাই। তাঁর সুপ্রশস্ত উদ্যানবেষ্টিত সুসমৃদ্ধ অট্টালিকাব আদ্যোপান্ত রং বদলানো চুণ ফিরানো হইযাছিল, এত বড যুদ্ধেব বাজাবেব দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতাকে অগ্রাহ্য করিয়া দরজা জানলা মায় কড়িকাঠসুদ্ধ নতুন বংয়ের চকচকে পালিশে ঝকঝকে কবিয়া তোলা হইয়াছে। আলোকাধাবগুলি সুমার্জ্জিত কয়েকটা নতুন তাব বসাইয়া তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শক্তিমান ইলেকট্রিক বাল্‌ব সন্নিবিষ্ট হওয়াতে বাত্রিবেলা বাহিরের নিরালোক অন্ধকারের নিবানন্দকে উপেক্ষা কবিয়া মোটা পর্দ্দা ও বন্ধ কপাটের ভিতব আলোকের দীপ্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কাশ্মীবি কাজেব টেবিল ক্লথ ও সেটির আচ্ছাদনগুলাব রংয়েব বাহার, ঐ দেশের এবং আরও অনেক দেশের রূপার মীনার তারের ও পালিশেব কাজগুলি ছায়ালোকে একটা স্বপ্নপুবীব মতই বৈচিত্র্য বিস্তার কবিয়াছে। সমস্তই যেন বাহিবেব দুঃখদৈন্যদুর্দ্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর অনেকখানি উপরের ও বহু উর্দ্ধলোকের, এ দুয়ের ভিতর কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই প্রকাণ্ড বাড়ীটার চার তলায় খান দুই ঘর নতুন তৈযার হইয়াছে। দেওয়ালে তেলের রংয়ে খুব ফিকা সবুজের স্বপ্নমায়া, জানলা দরজাযও ঠিক সেই রংয়েরই মোটা মোটা পর্দ্দা, জানলার পর্দ্দায় সাদা লেশের একটুখানি সূক্ষ্ম সমাবেশ। একটি ঘরের ঠিক মধ্যভাগে একখানি ফিকা সবুজে পাথরের গোল টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটি সবুজ রংয়ের ঘষা কাঁচের বড় ফুলদানী, সেটিতে

প্রত্যহ একটি গুচ্ছ সাদা পদ্ম অথবা শ্বেত চন্দ্রমল্লিকা, না হয়ত শুভ্র রজনীগন্ধা সাজাইয়া দেওয়া হয়। দেওয়ালেব সমস্ত ইলেকট্রিক বাতিগুলির উপর সমান রংয়ে রং মিলাইয়া সাদা ও সবুজের সেড দেওয়া।

এ ছাড়া আর কোন ফার্নিচাব আর কোনখানে রাখা হয় নাই এইজন্য যে এই দুটি ঘবের নতুন অধিকারিণীরূপে যিনি এ বাড়ীতে শীঘ্রই প্রবিষ্টা হইবেন তিনিই তাঁর পিতৃদত্ত যৌতুক হিসাবে সেই সমুদয় বস্তু তাঁর সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন। অবশ্য এই ঘরেব সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিযাই যে সমস্ত তাঁদের বাড়ীতে সংগৃহীত হইয়াছে অথবা হইতেছে। এ বাড়ীর সঙ্গে সে বাড়ীর রুচির বিশেষ বিভিন্নতা নাই এবং এ বাজারে এত সব মূল্যবান বস্তুজাত সংগ্রহ করার মত অর্থ ও সামর্থ্য তাঁদের এতটা বেশী না থাকিলেও প্রেষ্টিজের খাতিরে সে সত্যকে স্বীকার করিয়া পিছু হটিবার মত ডুষ্প্রবৃত্তিও তাঁদের মধ্যে ছিল না। আর স্যার অনুকুলের পুত্রেব সহিত যাহারা কন্যাব বিবাহ দিতে চায় ভগবান করুন তেমন ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাদের যেন কোনদিনই না ঘটিতে পরে।

এ বাড়ীতে বাড়ীর সমস্ত জিনিসের সঙ্গে মিল খাওয়াইয়াই একজন বাড়ীর গৃহিণী আছেন এবং তিনিই বলিতে গেলে এ বাড়ীর সর্ব্বাধিনায়িকা। স্যার অনুকুলের তিনি শুধুই গৃহিণী নহেন, গৃহিণী সচিব সখী ইত্যাদি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছিলেন, তিনি সেই রকমেরই একজন মহিলা। স্বামী বনগমন করিলে তিনি তাঁর মেহগনি পালঙ্ক ছাড়িযা তাঁর অনুগমন করিতেন কি না সে কথা কেমন করিয়া বলিব, যেহেতু তাঁর স্বামী কখন বনবাসে যান নাই। তবে তিনি যখন আমেরিকা ইউবোপ বা বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন লেডী চন্দ্রলেখা তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নাই। -আজকালকার দ্বীপনিবাসী পরস্বাপহরণকারী প্রবল প্রতাপ (ভূদেব) রাও নাকি জীবন্ত সীতাহরণ করেন না—তাঁরা নারী লুণ্ঠনের অপেক্ষা স্বামী ও সসার বস্তর প্রতি আগ্রহশীল, সেই জন্য

তাঁকে স্বামীর আদেশে পর গৃহবাসের প্রায়শ্চিত্তে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয় নাই; এমন কি কম বয়সে সুযোগ না থাকায় ও সে বয়সে ইউনিভারসিটি পরীক্ষা পর্য্যন্ত না উঠিয়াও তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলাইয়া অসনে বসনে আচারে ব্যবহারে পুরাতন শিক্ষাকে পরিহার করিয়া আধুনিক হইতে তাঁর পক্ষ হইতে কোন আপত্তিই উঠে নাই। অবশ্য সে আধুনিকতা আজিকার দিনে অতি আধুনিকতা নয়, আর তা হওয়াও সম্ভব নহে, যেহেতু তখনকার দিনের পক্ষে যেটা আধুনিকতা ছিল তিনি তো আর সে যুগকে অতিক্রম করিয়া তার বাহিরে যাইতে পারেন না। তখনও নারী পুরুষের সমান অধিকার বিঘোষিত হয় নাই, নারী পুরুষের "ছায়েব অনুবর্ত্তিনী" থাকিয়াই তারই আকর্ষণগ্রস্ত উপগ্রহের মত তাহার চারিপার্শ্বে আবর্ত্তিত হইত; পুরুষকে সে নিজের কেন্দ্র বলিয়াই ভুল করিত, বিশ্বাস করিত না যে সে স্বাধীন, সে স্বতন্ত্র, সে নিজেকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই! অসন বসন বদল করিলেও ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে তারা সম্মান না দিয়া পারিত না।

চন্দ্রলেখা সত্যকার গৃহিণী, স্বামীকে তাঁর বাহিরের কাজে নিয়োজিত থাকিতে দিয়া নিজের উপরেই এই সংসার তরণীর পরিচালনার সমুদয় দায়িত্বভার চাপাইয়া লইয়াছিলেন। নারী পুরুষের স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্র তিনি মনের সঙ্গে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া এঁদের মধ্যে সাংসারিক মনোবাদটা অল্পই ঘটিত; যেটা মানুষের, বিশেষ করিয়া আজকের দিনের মানুষের, জীবন যাত্রার পদে পদে ধাক্কা দিয়া তাহাদের উভয়তঃ জীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ায়।

চন্দ্রলেখার বড় ছোট দুটি মেয়ের মাঝখানে একটি মাত্র ছেলে পুরন্দর। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়া সে এখন কন্যাপুত্রের জননী। ছোট আজকালের হাওয়ায় বাড়িতেছে, কাজেই চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত খাটো ফ্রক পরিয়া "বব" করিয়া "বেবি" হইয়াছিল। ইদানীং শাড়ী পরিয়া কলেজে যায়, তা শুার অমুকূলের

কন্যার তো আর যুদ্ধের বাজারে শাড়ীর অভাব ঘটে নাই বা সস্তায় রং-চটা শাড়ী পরার কোন প্রয়োজনও ঘটে নাই। সে তার "বব"-করা চুলকে ততটাই বড় হইতে দিয়াছে আজকালকার আধুনিক মেয়েরা যতটা দেয়। মা চুল বাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকিলে সে তার খাটো চুলের ঝাপটা ঝাড়িয়া প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে, "ওঃ নো,—নো—সরি! না মা সে হবে না, চুলে ও সব নোংরা তেল ফেল আমি মাখবো না। তাহলে কিটী নেলী প্রিয়ম্বদারা আমায় ঠাট্টা করে খেয়ে ফেলবে। এমনিতেই তো কত কথাই বলে।"

"কি, বলে কি? বলবারই বা এতে আছে কি? চিরকাল ধরে ঐ ঘোড়ার ঝালর ঝুলিয়ে বেড়াবি না কি? বিয়ে থাওয়া হবে না?"

"কি আর অন্যায় বলে! ঐ কথাই তো ওরাও বলে—বলে ঐ দেখ না কোন্‌দিন তোর মা তোর একটা বর ঠিক করে তোকে ছাঁদনাতলায় না ঠেলে দেয়! সেদিন ফুলরেণু খোঁপা বেঁধে এসেছিল, তার দশা যা করলে সব্বাই মিলে, সে যদি দেখতে! বেচারী শুদ্ধ কাঁদতে বাকী রেখে ফিরে গেল, পরদিন থেকে চুল কেটে খোঁপার দায় উদ্ধার হয়ে বাঁচে।"

মা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন, "দিতে পারলে না তার মা মাথাটা শুদ্ধ মুড়িয়ে? আমি হলে দিতুম। যত সব!"

"হ্যাঁ দিতে বৈ কি! দাদাকে বলে দিতুম না।" বেলা ফোঁস করিয়া উঠিল। ছেলের সম্বন্ধে মায়ের যে একটুখানি দুর্ব্বলতা আছে সেটুকু তার তীক্ষ্ণ মনের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। মার চোখে ঈষৎ হাস্যরেখা ফুটিলেও তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "দিস্ বলে, তোর দাদা আমায় ফাঁসি দেবে না কি? বড় যে যখন তখন দাদার ভয় দেখাতে শিখেছিস!"

মার স্বভাব যতই হোক মেয়ের অজ্ঞাত নয়, সে সহসা গরম স্বর নরম করিয়া ফেলিল, "আচ্ছা মা! তুমি বিলাত ঘুরে এসেও এত সেকেলে রইলে কি করে

বলো তো? অথচ কত লোকে ভারতবর্ষ ছেড়ে, বাংলাদেশের বাইরে একটি পা-ও না নড়ে কি রকম আধুনিক হয়ে গেছে! এই তো তিলোত্তমা তার মাকে "মাম্মি" বলে ডাকে, মা তো তার কই সেজন্য রাগ করেন না। আর আমি যদি বলি তুমি হয়ত আমায় এই বয়সে মেবেই বসবে!"

মা মনে মনে হাসি চাপিলেও বাহিরে দিব্য গম্ভীর থাকিয়া কল্পিত কোপনতার সহিত উত্তর করিলেন, বলে একবার দেখ না মজা! মাকে মা না বলে বলবেন "মামী! কেন বাপকে "পিসেমশাই" বলতে পারবি না?"

"তা মেসোমশাইও তো বলতে পারা যায়! কি বলিস রে বেবী? জিজ্ঞাসা কর না তোর মাকে, এতে তার কোন আপত্তি আছে কি না।" গৃহস্বামী হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া এই কথাগুলি বলিয়াই বক্র কটাক্ষে বেবীর মায়ের গোপন হাস্যচকিত চোখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দ্রলেখা সচকিতে দৃষ্টি নত এবং ঠোঁট দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হাসিয়া ফেলা হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে স্বামীকে অনুযোগ করলেন, "সে হলে তো তুমি বর্ত্তে যেতে। এখন পর্য্যন্ত সে লোভ তোমার যায়নি সে আমি জানি। তা যাক্‌গে, তুমি ওকে কি চিরকাল ধরেই "বেবী" বলে বলে বেবি করে রাখবে? ওসব ফিরিঙ্গিয়ানা আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে, কেন নাম ধরে ডাকলেই তো পার।"

স্যার অনুকূল একখানা সোফায় বসিতে বসিতে হাস্যস্মিত মুখ তুলিয়া কহিলেন, "সে নামটি কি যেটি ধরে ডাকবো? আমি তো ভুলেই গেছি। কিরে বেব্—থুড়ি, মেয়েটি, তোর ভাল নাম তোর মা কি রেখেছিলেন সুতিকাগারেব ষষ্ঠী পূজায়? বলে দে তো।"

মেয়ের মন মায়ের প্রতি অসন্তোষে ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছিল। বাপের প্রশ্নোত্তরে তারই খানিকটা বহিঃপ্রকাশ করিয়া সে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ষষ্ঠী পূজায়! মেয়েদের

বুঝি আবার ষষ্ঠী পূজা হয় ? সে সব তো হয়ে থাকে সৃষ্টিধর বংশধরদের বেলায়। কেন ঠাকুমা বলতেন শোননি—

"মেয়ে মেয়ে মেয়ে
ভূষ করলে খেয়ে
হরিভক্তি উড়ে গেল
মেয়ের পানে চেয়ে।"

বাপ হাসিয়া হাত বাড়াইয়া স্নেহভরে ডাকিলেন, "আয় মা, আমার কাছে আয়। নাই বা তোর সূতিকা পূজায় ভাল নাম রাখা হয়েছে, আমার তো তুই মা, এবার থেকে মা বলেই তোকে ডাকবো এখন।"

মেয়ে কাছে আসিলে বুকে টানিয়া মাথায় মুখে আদরের স্পর্শ দিতে দিতে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নাম তোর একটা, এই ধর্ যে কেউ হোক, ধর্ স্কুলের রেজিষ্ট্রারে লিখে দিয়ে এসেছিল, সেটা কি বল্তো ?"

মেয়ের মায়ের প্রতি অভিমান বাপের আদরে অনেকটাই প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল, সানন্দে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সস্মিতহাস্যে উত্তর করিল, "উত্তরা, বাবা। তা এ নামটা কিন্তু খুব মন্দ না, না ? আচ্ছা মা, ঠিক করে বল দেখি, এ নাম তুমি নিশ্চয় রাখোনি, তুমি হলে,—তুমি হলে উত্তরা না রেখে হয়ত সৈরিন্ধ্রী রাখতে, কি বল ?"

মা তাঁর হাতের কার্পেটের আসনের খালি জমিটি দ্রুত হস্তে কালো উলে ভরাইতেছিলেন, পাকাদেখার দিনে কুটুম্ব বাড়ীর লোকদের খাইতে বসাইবার জন্য বারো খানি আসন তিনি নিজের হাতে তৈরী করিয়াছেন, এইখানিই তার শেষ। সূচে পশম পরাইতে পরাইতে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, আমি যে তোর সৎমা, তোকে দুচক্ষু পেড়ে দেখতে পারি কি ! তবে তোর খুব কপালের জোর, তাই তোর নাম রাখিনি জগদম্বা।"

সবাই হাসিলেন।

ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কাকের কলরবের সীমা থাকে না, পথের ধারে ধারের গাছগুলায় তারা রাতের অতিথি। এখন রাজপথের অনির্দ্দেশ্য গতি বুভুক্ষিত ভিখারীগুলার মতই জীবিকান্বেষী রূপে দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। সমস্ত সদ্যজাগ্রত্ বিশ্ববাসীর মতই তাদের কণ্ঠে সেই একই সুর, একই ধ্বনি—

"আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

কাকেদের বিজয় যাত্রাব মার্চ্চিং সং বা বিজয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই এক দিক দিয়া ট্রামের ঘড়ঘড়, রিক্সার টিংটিং, বাসের ঝক্‌ঝক্, মোটবেব পোঁ পোঁ এবং অপর দিক দিয়া বেতারের প্রভাত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া গেল,—

"ভোর হইল মম মানস বিহঙ্গ
ডাকো নিজ রবে প্রাণেশে।"

সঙ্গীতে ও কোলাহলে এমনি করিয়াই সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাই মানুষ জগতে তিষ্ঠিতে পারে।

সত্যব্রত নিয়োগীর বাড়ীখানা খুব বড়, খুব সেকেলে বনিয়াদীবাড়ীর বনিয়াদ নিশ্চয়ই খুব পাকা; শতাধিক বর্ষেও তাকে কিছুমাত্র কাবু করিতে পারে নাই, তা' তার বাহ্যিক চেহারাতেই প্রকাশ পাইতেছে। অবশ্য সম্প্রতি ভাল করিয়াই মেরামত করা হইয়াছে নচেৎ উপরের খোলসটা কিছু কিছু জখম হইয়াছিল বই কি! যুদ্ধের বাজার বলিয়া কাঠের উপর রং লাগানো আর সম্ভবপর হয় নাই, সবাই তো আর স্যার অনুকূলের মত বড়লোক নয়! ছেঁড়া শালের কাঁথায় ফরসা পুরনো কাপড়ের ওয়াড় পরাইয়া শীত নিবারণ এদিনে অনেককেই করিতে হইতেছে—অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে যাদের পিতৃপুরুষেরা খাঁটি কাশ্মীরী শাল উত্তর

পুরুষদের সেবার জন্য রাখিয়াছিলেন, তারাই, না হলে আজ ছেঁড়া কাপড়ের কাঁথা করিতেই তো কাপড় জুটিতেছে না!

বাড়ীখানি প্রকাণ্ড, কিন্তু হইলে কি হয় একান্ত পুরাতন ফ্যাশনের। সৌভাগ্যক্রমে মোটা থামের মাথায় চড়িয়া একটি লোহার ঘেরা গাড়ীবারান্দার পর একটি দিব্য লম্বা চওড়া ড্রয়িংরুম, ভারী ভারী ওজনের ভিক্টোরিয়া প্রথম যুগের কৌচ কেদারা ঝাড় দেওয়ালগিরি সমেত সুসজ্জিত হইয়া আছে; তাই এ বাড়ীর গৃহবাসিনী আজ পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত লজ্জার আঘাতে মরিয়া যান নাই, তাঁদের বাড়ীর অত্যাধুনিক বন্ধু এবং বান্ধবীদের কাছে কিঞ্চিৎ খাটো হইয়া থাকিয়াও কোনমতে বাঁচিয়া আছেন। এই বহির্বাটির ওপাশে অন্দরমহল, ব্যাপারটি কিন্তু একান্ত অসহ্য বোঝার মতই তাঁর বুকে অহরহ চাপিয়া থাকিয়া তাঁর জীবনকে একান্তরূপেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই চক-মেলানো রেলিং-ঘেরা দালান-ওয়ালা ঘরগুলির দরজা জানালা ছোট ছোট, আয়তনে ঘরগুলি আঠাশ ফিটের বেশী নয়, কাঠের কড়ি বেশ মোটা মোটা এবং কয়েকটিতে মাত্র ছাড়া কাঁচের সার্শিশুদ্ধ নাই! এই পৈতৃক বাড়ী বেচিয়া সাহেব পাড়ায় অন্ততঃ বালিগঞ্জে হালফ্যাশনের একখানি নতুন বাড়ীর জন্য কি তিনি স্বামীকে কম উপরোধ ও অনুরোধ করিয়াছেন!

সত্যব্রতকে বহু অনুরোধেও অনুপমা রাজী করাইতে পারেন নাই, অনেক মান অভিমানের বন্যা এ লইয়া তাঁদের মধ্যে বহিয়া গিয়াছে; এমন কি অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, বৈপ্লবিক অভিযান যত কিছু উপায় বিধান শত্রুপক্ষের পরাজয় জন্য জগতে বিহিত আছে, সত্যব্রত গৃহিণী কিছুই বাদ দেন নাই। কিন্তু সত্যব্রত এদিকে শান্তশিষ্টটি দেখিতে হইলে কি হয়, বাপ মা'র দেওয়া নামের মর্য্যাদা খাটো করেন নাই। কখন হাসিয়া রসিকতা করিয়া, কখন গম্ভীর হইয়া নীরব ঔদাস্যে পত্নীর সমস্ত যুক্তি তর্ককে ভাসিয়া যাইতে দিয়া এই শত-কেলে পৈতৃক গৃহকেই কামড়াইয়া

পড়িয়া থাকিয়াছেন। প্রথমদিকে একবার মাত্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "এ বাড়ীতে আমার ঠাকুরমা মা (তুমি নিজেও) বউ হয়ে এসে দুধ-আলতার পাথরে পা রেখে দাঁড়িয়েছিল; আমার বাবার, আমার, পূর্ণ, নিতুর ষেঠেরা পূজা থেকে অন্নপ্রাশন আর উপনয়নও হয়েছে; ঠাকুরদা মশাইয়ের বাবার মার মৃত্যু-শয্যা এরই কোলে পাতা, তাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণ এরই গায়ের বাতাসে মিলিয়ে রয়েছে; আমিও আমার এই মায়ের বুকে শেষ নিশ্বাস ফেলতে চাই। এ বাড়ী, তুমি আমায় বেচতে বলো না, অনুপ!"

অনুপমা নিদারুণ বিরক্তিভরে মুখ ঘুরাইয়া জবাব দিয়াছিল, "মরবার জন্য কেউ ঘর করে না, বাঁচবার জন্যই করে; মরণকালে না হয় এর কাছে আসা যাবে, এখন ভাড়া দিলেও তো চলে।"

সত্যব্রত ঈষৎ বিমনা হইয়া ক্ষণপরে মৃদুহাস্যে প্রশ্ন করেন, "মরণের গ্যারান্টি দিতে পার? সে হয় না, যা হয় না, তা বোলো না। এর সমুদয় অণুতে পরমাণুতে আমার তিন পুরুষের সমুদয় জন্মমৃত্যুর সুখ দুঃখের ইতিহাস নিবিড় হয়ে জড়িয়ে আছে, এর মধ্যে বাইরের লোকের বাস করার কল্পনা আমি করতেই পারিনে। আমায় এইখানেই তুমি থাকতে দাও, বেরিয়ে যেতে বোলো না।"

অনুপমা স্বামীর এই ভাবপ্রবণতার অর্থ বুঝিতেই পারে না, কাজেই সে তার কোন মূল্যও দেয় না। ঘোর বিদ্বিষ্ট অভিমানে তখনকার মত নীরব থাকিলেও নিবৃত্ত সে আজও হয় নাই। এই পাতালবাসিনীর চিত্ত স্বর্গবাস অন্ততঃ মর্ত্ত-নিবাসেরও দারুণ তৃষ্ণায় পুড়িতেছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। তাই আজও একান্ত "নীরস" "নিসেধো" এবং কতকটা নির্ব্বোধ স্বামীর পৈতৃক-প্রীতির প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণায় চিত্তপ্রাণ আদ্যোপান্তই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এ লইয়া কখনও ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মত স্তব্ধ গম্ভীর, কখনও আসন্নবর্ষী জলদের মত বজ্রগর্ভ, কখনও মৃদু বর্ষণের, কখনও বর্ষার মত

অশ্রান্ত ধারাপাতে তিনি স্বামীকে সন্ত্রস্ত দগ্ধ বা আদ্র করিয়া দিতে সমর্থ হন নাই। অগত্যা অনুপমা ঐ বাড়ীরই সবচেয়ে বড় ঘরখানাকে আগাগোড়া সংস্কারপূর্ব্বক অত্যাধুনিক ফ্যাশনে সজ্জিত করিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তি লাভের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। সেকেলে সিড়ির দেওয়ালে হালে আঁকা খানকতক ছবি টাঙ্গাইয়া, গাড়ী-বারান্দায় পামের টব সাজাইয়া, ছেলেমেয়েদেব পরিচ্ছদে, চুলের ফ্যাশনে, চায়ের টেবিলে ভাতের পাতে কাঁটা চামচের ব্যবহারে সর্ব্বত্রই সজোর বিদ্রোহ জ্ঞাপন করিয়া স্বামীকে বিব্রত ও বিপন্ন করিতে চেষ্টার ক্রটি তিনি করেন নাই। ফলে কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁর স্বামীর নির্ব্বিকার নির্ব্বিরোধিতায় তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই, সেজন্যও মনে মনে তিনি দুঃখিত। সত্যব্রত স্ত্রীকে কিছুতেই বাধা দেন না, তাকে নিজ পথে চলিতে দিয়া নিজের পূর্ব্বাপর বাঁধা পথেই নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছেন, কাজেই এক তরফা আর কতই বিরোধ হইবে। ইদানীং এ বাড়ীতে এইটাই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে যে, অনুপমা এবং তাঁর ছেলেমেয়েবা এক ধারায় চলিয়া থাকেন, আর সত্যব্রতর জীবনের ক্ষীণধারা তার পুরাতন খাতেই মৃদু প্রবাহে বহিয়া চলে; পরস্পরের কোনই বিরোধ ঘটে না। সত্যব্রত ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যের পর ঘণ্টা দুই ধরিয়া আহ্নিক করেন, গীতাপাঠ করেন; অনুপমা পুত্রকন্যা পরিবৃতা হইয়া চায়ের মজলিস জমাইয়া তোলেন। কেহ কোন কথা বলিলে বলেন, "কেন শুধু শুধু শুকিয়ে মরতে গেলুম। উনি তো খুব চুটিয়ে ধর্ম্মচর্চ্চা করছেনই, আমার যখন তাতে অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ বরাদ্দ রয়েইছে তখন ফালতু নিয়ে ওঁর উপরে উঠে গিয়ে কি পতিব্রত-ধর্ম্মের হানি করবো?"

মায়ের এই অকাট্য যুক্তি শুনিয়া মেয়েরাও সমর্থনসূচক চাপা হাসি হাসিয়াছে। সমবয়সীরা কেহ কেহ অবশ্য অপ্রতিবাদে এই সুযুক্তি গ্রহণ করেন নাই, উপরন্তু তর্ক করিয়াছেন যে "সহধর্ম্মিণী"—শব্দের অর্থ এ নয় যে স্বামীই অর্থার্জ্জনের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ধর্ম্মার্জ্জনও করিবেন, আর স্ত্রী ভিন্নপথে ফুর্ত্তি করিয়া

বেড়াইয়া যথাকালে তার অর্দ্ধেক ভাগ লইবে আদালতের আইনের সেপারেশনের মত দাবী জানাইয়া! অনুপমা তাহাতে ভয় অবশ্য পান নাই।

ইদানীং মাটিতে বসিয়া ভাত খাওয়া যায় না, ডিনার টেবিল কেনা হইয়াছে, ছোট্ট একটা ঘরে সেটা ঘর জুড়িয়া বসিয়াছে। বামুন ঠাকুরই রাঁধে, তবে হাফ-হাতার সার্ট পরিয়া পরিবেশন করিতে হয়। সত্যব্রত অন্যঘরে তাঁর পৈতৃক বড পিঁড়িতে বসিয়াই ভাত খান। মাটিতে জলের ছিটা দিয়া ভাতের থালার ঠাঁই করিয়া দিতে হয়। হাত-মুখ ধুইতে তাঁর এক বালতি জল লাগে, সে জল তাঁর চাকর বালতি মাজিয়া কলে ধরিয়া চাপা দিয়া রাখে।

ছেলেরা আজকাল কে-ই বা আচার নিয়মে চলিতে চায়, মায়েদের ভয়েই যেটুকু করে। এ বাড়ীর ছেলেরা তাই মায়ের কল্যাণে অনাচার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতে না হওয়ায় যৎপরোনাস্তি মাতৃভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মেয়ে প্রিয়তমার তো কথাই নাই। নিকটস্থ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করার পর, বাপের ইচ্ছা ছিল না তাকে কলেজে দিতে; কিন্তু পারিবারিক আর সকল ব্যাপারের মতই তাঁর এ অনিচ্ছাও কিছুমাত্র মূল্য পায় নাই। অনুপমা একান্ত জিদ করিয়া তাহাকে স্কটিশচার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি করাইলেন। বেথুন কলেজেই যে মেয়েদের পড়িতে হইবে এমন কি কথা আছে! 'কো-এডুকেশনে' মেয়েদের মন প্রসারতা লাভ করে, দৃষ্টি খুলিয়া যায়। সত্যব্রত একবার ক্ষীণ প্রতিবাদে জানাইয়াছিলেন যে, যখন কোন ছেলে মেয়েদের কলেজে পড়ে না তখন মেয়েদেরই বা উপায় থাকতে ছেলেদের কলেজে যাওয়া কেন? ছেলেদের দৃষ্টির বা মনের এর জন্য কিছুমাত্র ক্ষতি হচ্ছে বলে তো তারা প্রতিবিধান চাইছে না!

অনুপমা উন্নতনাসা আরও একটু উচ্চে তুলিয়া সবিদ্রূপে সহাস্যে স-তাচ্ছিল্যে জবাব দিয়া বুঝাইলেন, "ক্ষতি হচ্ছে নাই বা কে বললে? তুমি যদি আজকালকার মত শিক্ষা পেতে তাহলে আমার হাড় মাস এমন করে জলে পুড়ে খাক্ হয়ে যেত

না। মেয়েটিকে একটি গাড়ল করে গড়ে নিয়ে কোন্ ভদ্র-সন্তানের মাথাটি খাবো ?"

"ওঃ, আচ্ছা, তাহলে সেটা করে কাজ নেই। কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম্ম হওয়াই বিধেয়, আধুনিক ব্যাকরণে তাই লিখেছে !"

প্রিয়তমা বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, দৃঢ় বিশ্বাস আছে পাশ করিবে, ইংলিশে অনারস´ পাইবে কি না সে সম্বন্ধে মেয়ের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, মায়ের মনে কিন্তু কোনই দ্বিধা নাই। তিনি সগর্ব্বে বলিয়া বেড়াইতেছেন, "আজকাল তো আর ডবল অনার্স´ নিতে দেয় না ; দিলে প্রিয় তার বাপের মত যে ফার্ষ্ট´ ক্লাশ ডবল অনার্স´ না পেত তা নয়। ছেলেরা যা পারে মেয়েরাই বা তা না পারবে কেন ? কোন্ বিষয়ে তারা কম যায় ?"

'ফলেন পরিচীয়তে'—যথাকালেই জানা যাইবে। ইতিমধ্যে অনেক দেখিয়া শুনিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া তিনি মেয়ের জন্য এক বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি অবশ্য অনেকের কাছেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, পৃথিবীর সব ছেলেকেই আর সব মেয়েকেই যে বিয়ে করতে হবে তার কি মানে আছে ? বিশেষ করে যে সব মেয়েদের মাথায় ব্রেন আছে, মনে সাহস আছে, উদ্যম আছে তারা সাত সকালে বিয়ে করে ছেলে কোলে করে ভাতের হাঁড়ির তদারক করতে যাবে, কি দুঃখে ! জীবনটাকে একটু 'এঞ্জয়' করে নিক না দুদিন ; বিয়ে যদি করতেই হয়, সুবিধা মতই না হয় হবে একদিন।"

অনুপমার মাসতুতো ননদ বিস্মিত হইয়া এই বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, "এমন কথা বোলো না—বউ। মেয়েমানুষ বয়সকালে বিয়ে না দিলে কোন্ পথে যায় না যায়, কারও পাল্লায় পড়েই যদি গেল। ভদ্রঘরের মেয়ে বিয়ে করে ভদ্রভাবে ঘর সংসার করবে, এই তো মা বাপের আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত এবং তারই জন্যে যত্ন নেওয়া কর্ত্তব্য।"

অনুপমা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলেন, "না হয় সংসার পথে চলতে চলতে দুটো একটা হোঁচটই খেলে; তাতেই বা এত কি এল গেল ঠাকুরঝি! ছেলেদের যদি ছেড়ে রাখতে পার, মেয়েদের বেলায়ই কি যত অপরাধ?"

ঠাকুরঝি—"ছি ছি বউ, কি বলছো" ছাড়া আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর মতন [illegible]র্ণচিত্তার এর বেশী বলিবারই বা কি আছে? ছেলেমেয়েদেব স্খলন পতনকে যে মা ভয় করে না—সেই গর্ভধারিণীকে এঁরা হয়ত মায়েব সম্মান দিতেই অপারগ! "শিব ভূত্বা শিবমর্চ্চয়েৎ" স্বরূব জ্ঞান না হইলে বোধগম্য হয় কিরূপে? সেকেলে মেয়েরা যাঁরা প্রবাদ বাক্য তৈরী করিয়াছেন—

"মরলে মেয়ে উড়বে ছাই
তখন মেয়ের গুণ গাই।"

—অর্থাৎ অকলঙ্ক চরিত্র [illegible]র মৃত্যু হইলেও তার গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক ক্রন্দন করাতেও তাঁরা গৌরব অনুভব করিতেন। তা করুন, তাঁদের চাইতে এদিনের মায়েরা অনেক উদার; মেয়েরা দুবার "হোঁচট" খাইলেও তাঁদেব আপত্তি নাই, তাতে নাকি "দুনিয়া"কে জানা যায়, জীবনকে 'এঞ্জয়' করা হয়। অপূর্ব্ব!

অনুপমা কিন্তু মেয়ের বিয়ের জন্য ভিতরে ভিতরে যে চেষ্টা না করিতেছিলেন এমন নয়। প্রিয়তমাকে দেখিতে ভাল, বাপেরও পয়সার খ্যাতি আছে, বনিয়াদি ঘর, মেয়েও তার ওপর শিক্ষিতা। বিবাহের সম্বন্ধ অনেকগুলোই পাওয়া গিয়াছিল,

কিন্তু অনুপমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, তিনি তাঁর মেয়েকে তাঁর বাপমার মত ঠকাইতে চান না। বনিয়াদি ঘর বা পাশ করা ছেলের খাতিরে তিনি তাঁর মেয়েকে একটা পচা বাড়ীওয়ালা পাত্রের হাতে দিবেন না। চৌরঙ্গী বা বালিগঞ্জে হালফ্যাশনের বাড়ী, মোটর গাড়ী, টেলিফোন যাদের নাই প্রিয়'র পা সেখানে পড়িবে না। কলিকাতার বাহিরে তার যাওয়ার কথাই ওঠে না। এমন করিয়া ছাঁটাই বাছাই হইতে হইতে অবশেষে মনের মত পাত্র এইবারে জুটিয়াছে।

স্যর অনুকূলচন্দ্র রায়ের একমাত্র পুত্র—পুরন্দর। পুরন্দর এর উপর বিলাতফেরৎ ব্যারিষ্টার এবং সুদর্শন। প্রিয়তমাকে পছন্দ হইয়াছে। কোষ্ঠির কথা উঠিয়াছিল, অনুপমা ও সব মানেন না; এদিকে চন্দ্রলেখার কুসংস্কারের সীমা নাই, তিনি ষষ্ঠী মার্কণ্ড মনসা শীতলা হইতে দৈব দৈবজ্ঞ যত কিছু খুঁটিনাটি সমস্তই একাধারে মানিয়া বসিয়া আছেন। জ্বালাতন! এই লইয়া বিবাহ সম্বন্ধ বুঝি ভাঙ্গিয়াই বা যায়। যাহোক, সঙ্কীর্ণচিত্তা শাশুড়ীটা না থাকিলেই ছিল ভাল, কিন্তু সে তো আর অমর নয়! আর স্যর অনুকূলের বাড়ীর মত একখানা বাড়ী সহজে কি কাহার ভাগ্যে জোটে,—বিশেষতঃ যখন ঐ বাড়ীতে দ্বিতীয় কোন ভাগীদার নাই। অনুপমা আন্দাজে আন্দাজে মেয়ের একটি জন্মপত্রিকা তৈরি করাইলেন, তাহাতে কন্যার রাক্ষসগণ হইল বলিয়া অপরকে দিয়া সময়টা ঘণ্টাকয়েক পিছাইয়া দিয়া আর একখানি কোষ্ঠিতে দেবগণ হইলেও সপ্তমে মঙ্গল দোষস্থ হওয়ায় প্রথমোক্তকেই আবার বলিলেন "ওর কোষ্ঠি হারিয়ে গেছে, আমার বেশ মনে আছে যে ওর দেবগণ ছিল আর সপ্তমে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, লগ্নে যেন চন্দ্র না বুধ না রবি এই রকম কি গ্রহ ছিল। সময়টা আর তারিখটা কিন্তু গোল হয়ে গেছে।"

দৈবজ্ঞ সেইরূপ একখানি কোষ্ঠি করিয়া দিলে সেখানি চালের জালায় কয়েকদিন রাখিয়া বেশ পুরাতন মূর্ত্তি ধরিলে স্যরের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আরসুলাকে দু এক স্থানে একটু কাটাকুটি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এ রকম কোষ্ঠির মিল না হওয়াই বিচিত্র।

পুরন্দর স্বচক্ষে মেয়ে দেখিতে আসিবেন না জানিয়া অনুপমা ঘোর বিরক্তি অনুভব করিলেন। আজকালকার দিনে এ কি রকম অসভ্য ছেলে? বলিয়া পাঠাইলেন বিয়ের আগে একটা চেনাশোনা হওয়া উচিত, ছেলের পছন্দর তো একটা দাম আছে।

কথাটা শুনিয়া পুরন্দর হাসিয়া ফেলিয়া তার মাকে বলিল, "তোমার চোখে

যদি ওরা মায়া-কাজল পরিয়ে দিয়ে থাকে তো, আমার চোখেই কি দেবে না ভেবেছ? তোমার চোখে তো আমি দেখেই নিইছি।"

মা বলিলেন, "তবু একবার—"

পুরন্দর বলিল, "রক্ষা কর।"

উত্তরা এ বাড়ীর মধ্যে আধুনিকতার বিশেষ ভক্ত। সে দাদার ভীরু-বশ্যতায় অসন্তুষ্ট হয়। ওর দোষেই তো মা তাকে আরও দাবাইয়া রাখেন, কথায় কথায় ছেলের তুলনা দেন। সে তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন দাদা? তুমি ক'নে দেখতে গেলেই কি কনে তোমার গলায় মালা পরিয়ে দেবে? মালা হাতে করে দাড়িয়ে আছে নাকি—সে ঘাপটি মেরে?"

পুরন্দর কহিল, "মালা—আধুনিক কনেরা দড়ি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকেন, সামনে গেলেই অ্যায়সা করে ফাঁস লাগিয়ে টেনে আনবেন না!"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে উত্তরা চেঁচাইয়া উঠিল, "দাদা! খবরদার ওসব বলবে না বলে দিচ্ছি।"

পুরন্দর নিরীহভাবে উত্তর করিল, "বেশ, আর বলবো না!"

তথাপি বিবাহের সমস্তই পাকা হইয়া গেল। এমন কি 'পাকা দেখা' পর্য্যন্ত বাকি থাকিল না, হীরার মালা দিয়া এরা প্রিয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন; পুরন্দরের হীরার বোতামের সেটটাও ভাল কমল হীরার। দেনা পাওনার কথা ওঠে নাই, সব সময় উঠাইবার প্রয়োজন হয় না, স্থল বিশেষে সেটা না ওঠাই ভাল, তাতে মানও থাকে, মর্য্যাদাও নষ্ট হয় না। অনুপমা ভাবী বেহানের নিমন্ত্রণে মেয়ের ভাবী ঘরকরনা দেখিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত প্রস্তাব পাশ করিয়া আসিয়াছেন যে, মেয়ে জামাইয়ের গৃহসামগ্রীর সমস্ত উপকরণ তিনিই ঐ ঘরের সহিত মিলাইয়া বিবাহ যৌতুকে দান করিবেন। চন্দ্রলেখা দিবেন বউকে হীরার স্যুট সে কথা তিনিও বেয়ানকে জানাইতে ভুল করেন নাই। বেয়ানের ইচ্ছা ছিল জিনিসগুলি

পূর্ব্বাহ্নেই দেখিয়া একটু রদবদল করিয়া নেন; কিন্তু পুরন্দরের মায়ের মাথা একটু মোটা, ইঙ্গিত বোঝেন না! অথবা তাঁর বুদ্ধি বেশীই সূক্ষ্ম, বুঝিয়াও অনভিপ্রেত ব্যাপারে না বোঝার ভাণ করেন, তিনিই জানেন। তা হোক, কথাবার্ত্তা ও নজর তো ভাল! মেয়ের অসুবিধা হইবে মনে হয় না। উত্তরাকেও তাঁর খুবই ভাল লাগিল, ছেলে তো তাঁর ঘরেও আছে, দেখা যাক্।

কলেজে প্রিয়তমাদের একটা দল ছিল; তার ভিতর কয়েকটি ছেলেও এপাশ-ওপাশ দিয়া একটু একটু মাথা ঢুকাইত। পরেশ ও ননী মল্লিকার দূর সম্পর্কের ভাই হয়, তারাই ছিল ঠিক "লেডিজম্যান।" মেয়েদের জন্য অসাধ্য সাধন করিয়া বেড়াইতেই তাহারা অভ্যস্ত। চবিত্রের সুনাম ছিল বলিয়া প্রফেসররা বা অভিভাবকেরা এদের সঙ্গে মেলামেশায় বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

পরেশরা তাদের বোনেদেব সম্পর্কে সহপাঠিনীদের "দিদিমণি" বলিয়া সম্বোধন করিত। এ লইয়া কোন কোন মেয়ে আপত্তি জানাইয়াছে, বলিয়াছে "আমরা কি মেয়ে স্কুলের টিচার?"

পরেশ জোড়হাতে জবাব দিয়াছে "আজ্ঞে না"; তাঁরা তো "দি", আপনারা হচ্ছেন "দি-দি-ম-ণি।" অগত্যা সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না।

মেয়েদের সভা-সমিতি করার আয়োজন, প্রদর্শনীতে সূচীশিল্প চিত্রকলা যার যা আছে দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থা, সঙ্গে গিয়া ফেরৎ আনা এ সকল ব্যাপারে তারা দু'জন ছিল সেচ্ছাসেবক। রক্ষণশীল অভিভাবকরাও তাদের সঙ্গে মেয়ে পাঠাতে আপত্তি করতেন না, তাঁরা জানতেন এরা কংগ্রেসী জেলখাটা, কলেজে রাষ্টিকেট হওয়া 'ভাল ছেলে'। পরেশ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বি. এস-সি. পরীক্ষার ঠিক এক মাস আগেই কোন বিশিষ্ট কারণে দুই বৎসরের জন্য রাষ্টিকেট হয় এবং দুই বৎসর পূর্ণ হইবার দিন কয়েক মাত্র পূর্ব্বে পিকেটিং করার সময় পুলিশের সঙ্গে বিরোধ করিয়া এক বৎসরের জন্য একবার এবং বাহির হইয়াই পুনশ্চ ন্যাশানাল ডে'তে ফ্লাগ লইয়া

ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করার সময় একটা সামান্য রকমের দাঙ্গা পরিচালনার দলপতিরূপে আর এক দফায় দুই বৎসর জেল খাটিয়া সদ্য মাসকয়েক মাত্র বাহিরে আসিয়াছে। এবার সে নিজের কাছেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া জেল দরজার বাহিরে পা রাখিয়াছিল এই বলিয়া যে, এবার সে যেমন করিয়াই হোক বি. এস-সি. পরীক্ষাটা দিবেই দিবে ; নহিলে আর ছোকরা দলের কাছে ইজ্জৎ থাকে না। বাহির হইবার সময় জেলারকে সবিনয়ে কহিয়াছিল, "মশাই যদি এতটাই করলেন, আরও একটু উপকার করতেও পারতেন, আরও মাসখানেক যদি আমার ভারটা বইতেন।"

জেলার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "সে কি, কেন ?" ভাবিলেন লোকটা হয়ত "জেল বার্ড" বনিয়া গিয়াছে ; খাঁচার পাখী খাঁচায় থাকিতেই অভ্যস্ত হইয়াছে, খাটিয়া খাওয়ার অভ্যাস নাই, বাহির হইতে ভয় পায়।

পরেশ বলিল, "যে সব উড়ো উড়ো খবর শুনছিলুম, হাত দুটো নিস্‌পিস্‌ করছে কি না ; হঠাৎ আবার কি-না-কি করেই ফেলি। তাই বলছিলুম কি, যে একেবারে সদ্য সদ্যই বার হয়ে পরীক্ষাটা দিতে পারতুম। এই আর কি !"

যা হোক, ভাল অভিভাবকের চেষ্টায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হইলেও পূর্ব্বেকার পুরা প্র্যাকৃটিক্যাল করা থাকার জন্য এবং বিশেষ ব্যবস্থায় তাকে পুরনো বিদ্যা ঝালাইয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ছেলেমেয়ে মহলে সে স্বনামধন্য হইয়াছে এবং পরীক্ষাও দিয়াছে ; দিবার পর অনেকের কাছেই বলিয়া বেড়াইতেছে, "এই একটা লাভ হবে যে অন্ততঃ বি. এস-সি. ফেল বলতে পারা যাবে, এখন কোন ডিগ্রিই তো নেই।"

একজন প্রফেসর কথাটা শুনিয়াছিলেন, কয়েকজনের সামনে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বি. এস-সি. ফেল ! ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স তো ওর ধরাই আছে, মেডালিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। ও সব ছেলে ক্ষণজন্মাদের ভিতরকার একজন।"

পরীক্ষাটা এবার যাই হোক ভালয় ভালয় চুকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তার গ্রহ-

সংস্থানই নাকি ভাল নয়। শনি রাহু কেতু মঙ্গল অর্থাৎ পাপগ্রহমাত্রই সুযোগ পাইলেই রবি বুধ বৃহস্পতি এবং তার প্রধান সহায় শুক্রকে অভিভব করিয়া এপাশ-ওপাশ দিয়া কুদৃষ্টি হানিতে ছাড়ে না। হঠাৎ একটা ঐ রকমই কোন গ্রহের ফেরে সে আবার একবার পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ঝঞ্ঝাবহুল দিন চলিতেছে ; স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ব্যর্থতার পর শাসক সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু আরও রক্তিম হইয়া উঠিতেছে, শাসিতের চক্ষেও তার চিরসংশয়-শঙ্কিত দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষ এ যুগের দুর্য্যোধন যখন দূতবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রচার করিলেন—

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—

তখন অগত্যাই একটা আগুনে ঝড় উঠিবার সম্ভাবনা স্তব্ধ থাকিলে কি হয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রতিনিয়তই সুদূর পৃথিবী হইতে বাতাস ঠেলিয়া আনিতে লাগিল। নির্য্যাতিত মেদিনীপুরবাসীদের অসমাপ্ত সেবা করিতে গিয়া দুটি নির্য্যাতিতা নারীকে বাঁচাইতে পরেশ মাথায় পিঠে লাঠি খাইয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, শেষে বন্দুকের গুলিতে তাহাকে আয়ত্বে আনা হইয়াছে। অচৈতন্য অবস্থায় সে তখন একটা অর্দ্ধদগ্ধ কুটিরে শায়িত, হাসপাতালে তার মত লোক ভর্ত্তি করা সম্ভবপর হয় নাই। ননী যেদিন এই খবর পাইয়া তাদের বন্ধু এবং বান্ধবীদের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল সেদিন সহসা এই সৌখীন কলিকাতা নিবাসী মেয়েদের মধ্যে যেন একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে তাদের ডিবেটিং ক্লাবের সম্মিলনীতে, অবসরের আলোচনায়, পার্টির রহস্যালাপে বহুবারই দেশের দশার জন্য নানা মত প্রচারিত হইয়াছে ; কেহ কেহ আধুনিক কার্য্যাবলীর স্বপক্ষে, কেহ বা আবার বিপক্ষেও তর্ক করিয়াছে, কেহ কোনদিন হাতে হাতিয়ারে কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার কল্পনাও করে নাই। আজ এই নারীমর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মহাপ্রাণ যুবক শহীদ হইতে চলিয়াছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সহানুভূতিতে নারীচিত্তগুলি একেবারে যেন পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিল। তখনই পরিকল্পনা স্থির হইয়া গেল, স্বেচ্ছাসেবিকাদল গঠিত হইল, সাত-জন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে আহতদের সেবার জন্য ননীর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। প্রিয়তমা তাদের মধ্যে একজন।

মা শুনিয়া আহতা ফণিনীর মতই গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "মাথা খারাপ হয়ে গেছে! মাসখানেকও নেই বিয়ে হবে, এই সময় তুমি চললে কতকগুলো ছোঁড়া-ছুঁড়ির সঙ্গে দেশ উদ্ধার করতে! বলতে একটু মুখে বাধলোও না!"

প্রিয়র হাতে যত রকম অস্ত্র ছিল সে একে একে সমস্তই প্রয়োগ করিল, কিছুতেই ফল হইল না। তখন সে তার দাদাকে গিয়া ধরিল যে, ওদের সঙ্গে নাই হোক, সে তাকে সঙ্গে লইয়া অন্ততঃ একদিনের জন্য আহত পরেশকে যেন দেখাইয়া আনে। অতীশ তার মাকে লুকাইয়া অনেক কিছু করিয়া বেড়ায়, এ সব কাজে তার হাত-যশ আছে; বোনের সুমতি দেখিয়া সে খুশী হইয়া হাত পাতিল, "কি দিবি?"

প্রিয় বলিল, "পঁচিশটে টাকা, ঐটেই মাত্র আছে, আর কিছু নেই হাতে।"

অতীশ গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমার হাতে 'লবডঙ্কা', ঐতেই রাহা খরচ করতে হবে, ওটা সঙ্গে নিবি। তা আমি না হয় ধারে কারবার করতে রাজী আছি, ব্যারিষ্টারের গিন্নি হয়ে ওর কাছে যখন মুঠো মুঠো মোহর পাবি তখন দু এক মুঠো এদিক দিয়ে ছড়িয়ে দিস, তাহলেই হবে এখন।"

বিস্মিত হইয়া প্রিয় প্রশ্ন করিল, "মোহর?"

অতীশ কহিল, "তা নয় তো কি? এঃ তুই এমন বোকা! ব্যারিষ্টাররা যে ফি পায় তাকে বলে মোহর। আসলে অবশ্য টাকা বা ছাপের কাগজেই সেটা পেয়ে থাকে, ওটা একটা পুরনো ট্রাডিসন মাত্র। এককালে মোহরের চলন ছিল, আজও বিলাতে পাউণ্ড চলে। টাকার হিসাবে সতের টাকায় এক মোহর ধরে।"

প্রিয়'র বিস্ফারিতচক্ষু সহজ হইয়া আসিল, মোহরের বাগানের কল্পনা হইতে

স্বভাবে ফিরিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে যাবে কবে ?"

"দাঁড়া দেখি" বলিয়া অতীশ উঠিতে উঠিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল, "তৈরি হয়ে থাকিস, আমি একটা প্লান তৈরী করে একটু ভেবে চিন্তে দেখি ততক্ষণ।"

প্রিয় টাকাগুলি বাহির করিয়া ছোট্ট একটি মণিব্যাগে ভরিল, কি ভাবিয়া একটি সোনার আংটি ও কানের দুটি দুল ঐসঙ্গে ভরিল। একটি ছোট স্যুটকেসে যতটা সাধাসিধে তার কাপড় ছিল বাছিয়া ভরিল এবং নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিসপত্র যা নইলে নয় তাহা ভিন্ন আর কিছুই লইল না। আগ্রহে আশঙ্কায় তার চিত্ত এমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, হৃদ্‌স্পন্দন এতই দ্রুত হইয়া উঠিতেছিল যে, ভাল করিয়া সে যেন চলিতে ফিরিতেও পারিতেছিল না। নিজের এই একান্ত অপরিচিত মনোভাবের কোন অর্থগ্রহণও সে যেন করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন করিয়া তো আর কখনও অন্য কাহারও জন্য সে আকুলতা অনুভব করে নাই!

মা তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; সেকরা পান্না-মোতির সেট আনিয়াছে, চুড়ি ব্রেসলেটের মাপটা ঠিক আছে কি না হাতে পরাইয়া দেখিয়া লইবে, তারপর "ফিনিশিং টাচ" দিবে। মা বলিলেন, "হাতে পর দেখি, মাপটা যেন বেশী বড় হয়েছে, মনে হচ্ছে, না ?"

প্রিয় নিস্পৃহকণ্ঠে কহিল, "কই না, ও ঠিকই আছে।" সে প্রস্থানোদ্যত হইল।

"না না, পরেই দেখ না, কি এমন মহাভারত বইতে বলা হচ্ছে; জড়োয়া জিনিস সোনার মত হাতে ঝলমল করলে ঠিক মানায় না, বেশ খাপে খাপে বসে থাকবে, তবেই না ওর বাহার।"

নিরুৎসাহভাবেই প্রিয় আদেশ পালন করিল, মা বলিলেন, "না, ঠিকই হয়েছে, আচ্ছা, খুলে দে।"

অতীশ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়াই দ্রুতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, শিগগির তৈরী হয়ে নাও মা, এখুনি বোলপুর যেতে হবে; কাল ওখানে একজন অদ্ভুত

শক্তিমান্ রাশিয়ান্ ডান্সার আসছেন, যুদ্ধের জন্ম তিনি নাচ দেখিয়ে টাকা তুলছেন, এমন নাচ নাকি কেউ দেখেনি; তোমায় দেখাবো।

মা অবাক হইয়া কহিলেন, "ছেলের কথা শোন একবার! আমার নাকি এখন সেই সময়, আমি এখুনি ঘরসংসার ফেলে হুড়মুড় করে তোমার সেই বোলপুরের নৃত্যশালায় ছুটি। পাগল তো আর হইনি।"

অতীশ একান্ত অসহিষ্ণুতার সহিত কহিয়া উঠিল, "পাগল হওনি বলেই তো বলছি; এ যদি হাতে পেয়ে না দেখ তাহলেই কিন্তু সভ্য সমাজের লোকেরা তোমায় পাগলই বলবে। নাও, ওঠো ওঠো; শিগগির তৈরি হয়ে নাও, বেশী দেরী করলে ট্রেন ধরতে পারবো না; তোমারও মাটি হবে, আমারও মাটি হবে।" অতীশ অনিচ্ছুক মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইতে গেল। মায়ের কিন্তু নাচ দেখিবার ইচ্ছা নাই, তিনি আল্‌গা ভাবে ধরা হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া ছেলেকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, "কি ক্ষেপামী করিস বল্ তো? বিয়েব আর মাত্তর মাসখানেক আছে; চারদিকে কত কাজ, কত ঝঞ্ঝাট, এই কি বুড়োবয়সে খুকীপণা করে নাচ দেখতে আমাব বাড়ী ছেড়ে ছোটবার সময়? এই তো দেখছিস জহুরী বসে রয়েছে, সেকরা দরজি কে না আসছে! যেতে হয় তুই যা না বাপু!"

প্রিয়তমা ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে এতক্ষণ নীরব ছিল, এইবার অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে মায়ের অসমাপ্ত কথার পাদপূরণ করিয়া দিল, "আর ঐ প্রিয়টাকে নিয়ে যা। আহা ছেলে মানুষ, ওদেরই তো এখন দেখবার শোনবার সময়।"

মা কিছু বলিবার আগেই অতীশ ধমক দিয়া উঠিল "তোকে নিয়ে যাবো? কিছুতেই না। মা শুনচো, তোমার আহ্লাদী মেয়ের আবদারটা? একমাস পরে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বিয়ে, হীরের নেকলেশ আগাম বায়না নিয়ে বসে আছেন, আমি যাবো ওকে নিয়ে নাচ দেখতে? না বাপু, তোমার মত চড়া দরের মালের

দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। দরকার নেই ও সব ঝঞ্ঝাটে পড়বার, বেশ তাহলে আমি একলাই চল্লুম।"

অতীশ চলিয়া যায়, প্রিয় আবদারের কান্নায় গলা ধরাইয়া মাকে বলিল, "শুনলে তুমি, তোমার ছেলের কথা? বাব্বা! তোমার হাতে যে মেয়ে পড়বে তার কি দশাই যে তুমি করবে! মেয়ে বল্লে আমি হলুম মাল! কেন আমার বাপ মা কি টাকা নিয়ে আমায় কারু কাছে বিক্রি করছেন? আমার একটা আত্মমর্য্যাদা নেই? বিয়ে না হতেই আমি ঐ হীরের নেকলেশের দায়ে ওদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছি? অত বড় একটা সুযোগ, দু একদিনের জন্য অমন একটা জায়গায় যাওয়া সে আর আমার হবে না? কবে কাঁদের বাড়ী যেতে হবে বলে দিন গুণে গুণে বসে থাকতে হবে? তোমার এ সব উনবিংশ শতাব্দীর পচা আইডিয়া তুমি শিকেয় তুলে রেখে দাও গে—দাদা!"

অতীশ দরজায় পা দিয়া উত্তর কবিল, "কতকগুলো নীতি আছে যা সনাতন, যেমন পথি নারী বিবর্জ্জিতা।"

প্রিয় ঝঙ্কাব দিয়া উঠিল, "চাইনে যেতে তোমার সঙ্গে। মা আবার লোককে বড়াই করে বলেন! মা'র ছেলেটি তো সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর আবহাওয়া সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরুতমশায়ের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়েব ঠিক করছি দাঁড়াও না। বাবা ঠিক মত দেবেন; মাও দেখ, তখন না বলতে পারবেন না।"

অনুপমা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "নিয়ে যা না, ওকে দেখেই আসুক। না যেতে পেলে ঘরে বসে বসে কথার ঘায়ে আমায় তো পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবে।"

অতীশ দিব্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"আহ্লাদী মেয়ে যা হুকুম করবেন তাই শুনতে হবে? পুরন্দরের জীবন তাহলে যে অতিষ্ঠ করে তুলবে! অত প্রশ্রয় তুমি ওকে কি করে দিচ্ছো, মা!"

মা কথার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না, নিজের বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও

আত্মমর্য্যদার খাতিরে ভারী গলায় জবাব দিলেন, "তা যা ওর বরাতে আছে হবে, ছেলেমানুষ একটা আবদার ধরেছে, শোনই না; এর পরে তো আর তোকে বলতে যাবে না।"

অতীশ বক্র-কটাক্ষে বোনের হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা লইয়া নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াই কহিল, "নাও, চট করে উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হও। মনে রেখ নাচ দেখতে যাচ্ছ, নাচতে যাচ্ছ না! বেনারসী জর্জ্জেট, ক্রেপ-ডি-সিন ঢাকাই জংলা ফংলা পরো না। ভদ্রলোকের মতন খুব সাধাসিধে সেজো এবং সঙ্গেও নিও। ওখানকার তাই চাল। লিপষ্টিক যদি লিপে মাখো তো হাওড়া ষ্টেশন থেকেই ফেরৎ পাঠাব, তা বলে দিচ্ছি!"

প্রিয় আনন্দ-স্মিত মুখে উঠিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি যেন চব্বিশ ঘণ্টা লিপষ্টিক লাগিয়েই বসে রয়েছি; দোষ তোমার এমন বউ এনে, দেখবে তখন লিপষ্টিক লাগানো কাকে বলে! দুটি ঠোঁট দেখলে মনে হবে এক জোড়া টুকটুকে পাকা তেলাকুচো।"

আধপোড়া ও ভস্মীভূত কুটিরের শ্রেণী, গৃহহীন নিরাশ্রয় অভুক্ত কঙ্কালসার নরনারী, সদ্য শোকার্ত্ত মাতার আর্ত্তবিলাপ ডুবাইয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুদলের করুণ আর্ত্তনাদ—

প্রিয়তমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল! ঐ কলিকাতার প্রাসাদমণ্ডিত নগরীর বাহিরে, অতগুলা সিনেমা হাউসের, নাট্যালয়ের অসংখ্য ভিড়ের, সহস্র সহস্র বিলাস বৈভব-প্রসাধিত বিপণিশ্রেণীর অন্তরালে এত বড় নিষ্ঠুর অকরুণ অবস্থা মানুষের জন্য রক্ষিত আছে?

পরেশের সংজ্ঞা ফিরিয়াছিল। সহর হইতে একজন ভাল ডাক্তার আসিয়াছিলেন তাঁর বিশেষ চেষ্টায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হইয়াছিল। দেহবিদ্ধগুলি বাহির করার পর তৃতীয় দিনে তার জীবনের আশা করা হইতেছে। গ্রামে আসিয়া এ

সব সংবাদ পাইতেই অতীশ ও প্রিয়তমা হাসপাতালে গিয়া তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল।

পরেশ প্রিয়কে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; কথা কহিতে রীতিমত কষ্ট হয়, তথাপি কোনমতে বলিয়া উঠিল, "এ কি অসম্ভব কাণ্ড! আপনি এখানে? এ কেমন করে হ'ল?"

প্রিয় কাছে বসিয়া আর মুখের কাছে মুখ নত করিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমিও জানি না, কিন্তু হল তো। তুমি কথা কোয়ো না, শুধু আমি কি করতে পারি এইটুকু বলো।"

অতীশ কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকেও!"

পরেশের ক্লান্ত করুণ নি-রক্ত মুখে একটা রশ্মিছটা অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল, সে তার শক্তির অতীত ঈষৎ একটু জোরের সঙ্গেই দুজনকার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে গ্রামে যাও, ওদের বাঁচাবার বন্দোবস্ত কর; আর শুধুই ঐ একটি গ্রামই নয়, বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রামের এটি তো একটি প্রতীক মাত্র।"

প্রিয় পরেশকে স্পর্শ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আজ থেকে আমার জীবনের এই ব্রত হল।"

অতীশও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রসম্মোহিতের মতই সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আমারও।"

*　　*　　*　　*

ছেলেমেয়েদের নাচ দেখিতে যাওয়ার তৃতীয় দিনে অনুপমা দুজনের নিকট হইতে দুখানি পত্র পাইলেন, অবশ্য একখানি খামের মধ্যেই সে পত্র দুখানি আসিয়াছিল। বাজে খাতা হইতে ছেঁড়া কাগজে পেন্সিল দিয়া লেখা; প্রিয়র পত্রখানি এইরূপ :—

শ্রীচরণকমলেষু

মাগো, তুমি বোধ হয় এজন্মে আর কখনও তোমার মেয়েকে ক্ষমা করতে পারবে না। পারবে কি? কিন্তু কেন পারবে না মা?—তুমিই তো আমায় চিরদিন ধরে শিখিয়েছ নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই, পুরুষ যা পারে, নারীও তার অধিকারী। তবে আজ যদি আমি স্যার অনুকূল রায়ের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও তাঁর ব্যারিষ্টার ছেলেকে ছেড়ে আমার জীবনের গতি ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চাই, কেন পারবো না? দাদা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, সে এখানে অত্যাচার-বিধ্বস্ত পল্লীবাসীদের জন্য অনেকের সঙ্গে মিলে কাজ আরম্ভ করেছে, আমিও তাকে অনুসরণ করছি। মেয়ে আমাদের দলে বেশী নেই, আমরা দুজন মাত্র; কিন্তু আমার দৃষ্টান্ত নাকি শীঘ্রই খুব কার্য্যকরী হয়ে উঠবে। আচ্ছা, বড়লোকের বউ হলে কি আমাকে কেউ অনুসরণ করতো? বড় জোর আমার গহনা কাপড়েরই করতো। বাবাকে চিঠি আমি পরে লিখবো, এ চিঠি তাঁকে তুমি দেখিও এবং বোলো স্যার রায়কেও দেখাতে। তিনি বুদ্ধিমান ও ভাল লোক। তিনি বুঝবেন,—বুঝে আমায় হয়তো ক্ষমা করলেও করতে পারেন। না যদি করেন, অন্ততঃ এমন একটা বেয়াড়া মেয়ে যে তাঁর পুত্রবধূ হয়নি এতে সুখীই হবেন।

আমার জন্য কোন ভয় কোর না মা! দাদা আমার সহায় আছে, সে আমায় সকল অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমি সতীর মেয়ে সতী, আমার আবার ভয় কি? শতকোটি প্রণাম নিও। পরেশদার জীবনের আশা খুবই কম।

—তোমার অবাধ্য মেয়ে প্রিয়।

এক সপ্তাহ পরে দুই হাজার টাকা ও স্যার অনুকূলের পত্র আসিল। "মা আমার! তোমার বাবার ফেরৎ দেওয়া হীরের নেকলেশ বিক্রী করে এই টাকা তোমার কাজের জন্য পাঠালাম। আমারা তিনজনেই তোমার প্রতীক্ষা করে

রইলুম। তোমার অবসর হলে আমাদের মধ্যে একদিন তুমি ফিরে এস।

তোমার—ছেলে।

প্রায়শ্চিত্ত

বর্ষার আকাশ মেঘমলিন। দিনরাত ঝুপ ঝুপ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, থাকিয়া থাকিয়া গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, পুকুর ঘাট এবং রাস্তার নালায় ভেকদল সঙ্গীতরবে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা মাটির ঘর, উপরে গোলপাতার ঘন ছাউনি; ঘরের মধ্যে তক্তপোষে সেজমাত্বর বিছান—একপাশে একখানি জলচৌকীতে স্বরকি দিয়া মাজা পিতলের পরীওলা হুঁকাদানীতে একটি পিতলের জালি বাঁধানো হুঁকা, তার চারদিকে পশমের ফুল দিয়া তৈরী গোড়েমালা দিয়া জড়ানো, জলের সোরাইএর মুখে একটি সুমার্জ্জিত খাগড়াই কাঁসার জল পানের গ্লাস, পানের বাটায় ঘষা মাজা ছোট বাটিগুলি চুন খয়ের এবং মশলা-পাতিতে ভরা।

ঘরকন্নার সমস্ত কাজ সারিয়া মেয়েটি শান্ত প্রসন্নমুখে খিড়কির পুকুরে গা ধুইয়া আসিল। পুকুরের ওপারে মকরদের বাড়ী, বর্ষার অথৈ জলে-ভরা এই তকতকে পুষ্করিণীটি তাদেরই, শানবাঁধানো সিঁড়ির পৈঠায় বসিয়া গামছা দিয়া গা রগড়াইতেছিল, ঝম ঝম করিয়া কলসীর কাণায় চুড়ি বাজিতেই উৎকর্ণ হইয়া ঘাড় তুলিল। একটুখানি চাপা হাসি ওমনি ঠোঁটের কোনে খেলিয়া গেল। যে আসিল তারই প্রতীক্ষায় ছিল। আসিল যে, সেও এরই বয়সের একটি গৃহস্থ বধূ। তুজনকারই বয়স সম্ভবতঃ কুড়ির উপর উঠে নাই; তুচার মাস এদিক ওদিক হইতে পারে মাত্র। প্রথম আসা মেয়েটিই প্রথম সম্ভাষণ করিল, "মাগো, কতক্ষণ থেকে

তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে রয়েছি, ঠাকরুণের আর ফুরসৎ হয় না! কি হচ্ছিল?"

"হচ্ছিল মুণ্ড!" বলিয়া নবাগতা একটুখানি মলিন হাসি হাসিল। কাঁখে করিয়া যে কলসীটা আনিয়াছিল, সেটা নামাইয়া একটু আলস্য ভাঙ্গিয়া লইয়া পুনশ্চ ক্ষীণভাবে হাসিয়া কহিল, "কি হয়, জানিস না কি যে জিজ্ঞাসা করছিস? বাড়িতে কবে আর শান্তি আছে! তবে অন্যদিন একতরফাই হয়, আজ ভোল বদলেছে দেখছি,—আজ ওঁদের মায়ে পোয়ে খুব একচোট হয়ে গেল কিনা, তাই খাওয়া দাওয়া চুকতে, হাঁড়ি হেঁসেল তুলতে বেলা একেবারে গড়িয়ে গেছে।" এই বলিয়া মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া সে নতমুখে পুকুরের একদলা মাটি তুলিয়া লইয়া খানিক দুর্ব্বাঘাসের সহযোগে পিতলের ছোট ঘড়াটাকে মাজিতে আরম্ভ করিল। প্রকাশের ইচ্ছা স্পষ্ট না থাকিলেও মনে যে তাহার দারুণ একটা অস্বস্তি জমিয়া রহিয়াছে, সেটা তার এই উঠন্ত বয়সের পক্ষে একান্তই অসঙ্গতভাবে বিমর্ষ মুখখানির ভাবেই প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। তার সখী একথায় যেন বিশেষ আহত হইল। হাসি-মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান করিয়া সেও অত্যন্ত ব্যথিতভাবেই কহিয়া উঠিল, "বলিস কি মকর! আবার আজ? এই তো এই সেদিন ওদের মায়ে-ব্যাটায় তকরার হয়ে দশদিন কথা বন্ধ ছিল, ওমা, এর মধ্যে আবার কথাবার্ত্তা হলই বা কখন, আর ঝগড়াই বা কিসের? আচ্ছা ভাই, কথা যখন বন্ধ ছিল, তখন বন্ধ থাকলেই তো হতো; কথা কইলেই যখন ঝগড়া হয়, তখন এমন কথা কি না-কইলেই চলে না? আজ আবার হলো কি? আগে তো এক তরফাই হতো।"

মকর পুনশ্চ আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দুই বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি এ সময় একেবারেই নির্জ্জনতায় ভরিয়া আছে। আশে-পাশের বাঁশ পাতার মধ্যে বাতাসের আনাগোনায় অতি মৃদু

আন্দোলন ধ্বনি মাত্র কদাচিৎ শ্রুত হয়; আর কোথাও কোন শব্দ সাড়াটিও নাই। একটা বক কিছুক্ষণ আগে এক পায়ে দাঁড়াইয়া জলচরদের গতি নিরীক্ষণ করিতেছিল, একটা ফিঙ্গের জ্বালায় তিক্ত-বিরক্ত হইয়া এই কতক্ষণ হইল, দুই পা ছড়াইয়া দিয়া এবং ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। জল স্তব্ধ স্থির, শুসনী পাতা এবং শাপলা একটু দূর-জলকে ঢাকা দিয়া রাখিলেও সামনের জল বেশ পরিষ্কার, তার মধ্যে সূর্য্যের একটুখানি কিরণ চিক্ চিক্ করিতেছে, আর তাদের বাড়ীর ছাদের পাশের সজিনা গাছটার উঁচু ছায়াটি ফুটিয়া আছে; যে মেয়েটি আগে এই ঘাটে আসিয়া গামছা দিয়া গা ঘসিতেছিল তার নাম কনকলতা। কনকলতার প্রশ্নে মলিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা অসম্বৃত আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া ফেলিল, হয় রোজই যা তাই, কথা আর কি-ই বা আছে? পুরোনো কথাই তো। এই চার বচ্ছরেও মিটতে দেখলুম না, আর যত দিন না আমি এঁদের জ্বালায় আমার সতীনের মতন করে ওঁর হাত এড়িয়ে যাব, ততদিন পর্য্যন্ত উনি ছাড়বেনও না।" বলিতে বলিতে তার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আরম্ভ হইলে তো আর আমার নাম করে না।

কনক মেয়েটি বড় মায়াবী। তার ঘর-কন্নায় সুখ না থাক, স্বস্তি আছে, পয়সায় তারা ধনী না হোক, পারিবারিক শান্তিতে তারা অনেক ধনীকুল অপেক্ষা অনেক বেশী ধনী। নিজের শাশুড়ী নাই, সৎ-শাশুড়ী—সে হিসাবে সংসারিক অশান্তি ভোগ করিয়া মরিবার কথা তারই। কিন্তু তা হয় নাই, অনুকূলের মা-ভাগ্যের চাইতে কি জিতেনের সৎমা-ভাগ্য ভাল ছিল।

স্বামী বিয়োগের পর তিনটি ছেলেমেয়ে গলায় লইয়া দ্রবময়ী যখন সৎ-ছেলের হাত তোলার উপর আসিয়া পড়িলেন, আসল মায়ের মতই তিনি সেই সতীনপো ও তার বৌকে এমন আপন করিয়া লইতে সমর্থ হইলেন যে, এযাবৎ দুঃখের ভার

সুখ করিয়া খাইয়া বেশ হাসি মুখেই সবার দিন কাটিয়া যাইতেছিল। অভাব যতই থাকুক অভিযোগ কাহারও কিছু ছিল না।

কনকলতার মকরের জন্য তাই মনের মধ্যে বড় বেশী ব্যথা বাজিত, তারপরে তার সত্য করিয়াই একটা প্রবল সহানুভূতি ছিল। মানুষ যে শুধু শুধু কেমন করিয়া অনর্থক আপনাদেব মধ্যে দুঃখ ডাকিয়া আনে, সে যেন তাহা ভাবিয়াই পায় না। মলিনার এই সখের উক্তি তাহাকে যেন এক মুহূর্ত্তে সর্ব্ব শরীর চমকাইয়া দিল, সাতঙ্কে সে শিহরিয়া তার কলসী-মাজা হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ছি ছি, এমন কথা মুখেও আনিসনি ভাই, একটু ঝগড়া কোঁদল হয় বলেই কি অমনি প্রাণটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে? হাজার হোক বুড়-সুড় মানুষ, গুরুজন! না ভাই, মকর তুই ভাই, ওসব কিছু করে বসিসনি যেন! বল ভাই—আমায় ছুয়ে বল, কিছু করবিনি? আমাব মাথা খাস—আমার মরা মুখ দেখিস, আর যদি কখন অমন কথা মুখ দিয়ে বার করবি, না, একবার বললে হবে না, তিন সত্যি না করলে ছাড়ছিনি।"

কনকের সাবধানতায় ও সহানুভূতিতে কান্নার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া মলিনা অগত্যাই সখীব যথা নির্দ্দেশিত শপথ গ্রহণান্তে তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল; কিন্তু নিজে সে আর যেন এতটুকু সহানুভূতির উপর ভর বাখিয়া শান্ত হইতে পারিতেছিল না। নাঃ, সতীন বেচারী তার অনেক দুঃখেই মরিতে বাধ্য হইয়াছে। তবু তার অমন একটি সতীনঝি ছিল না। এটি যেন বোঝাব উপর একটি শাকের আঁটি! না, এমন করিয়া কখনও বেশি দিন চলে না। আহা স্বামী বেচারী সত্যসত্যই বড় দুঃখী! ওঁর মুখ চাহিয়া মরিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

অনুকূল কলিকাতার কোন মার্চ্চেণ্ট অফিসে কাজ করে, ডেলী পাসেঞ্জারী করিয়াই চাকরী বজায় রাখিয়াছে। বাড়ীতে পোষ্যও তার বেশী নয়, শুধু স্ত্রী আর

মা,—আর আছে প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে, নাম আহ্লাদী এবং বয়স তার আট বৎসর।

অনুকূলের বাপ মরিয়াছেন অনেকদিন, যখন তাহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার দুবার ছাড়িয়া একবারও বিবাহ হয় নাই, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে বছর দুই হয় ঢুকিয়াছে। এখন যাহাকে আই. এ. বলা হয় সে সময়ে তাহারই নাম ছিল এফ. এ., সে সেই বৎসর সেই পরীক্ষাটাই দিয়াছে; পরীক্ষার ফল কিন্তু তখনও বাহির হয় নাই, ঠিক এমনই সময়েই হঠাৎ অনুকূলের পিতার কলেরা রোগে মৃত্যু হইল। অনুকূল সে সময়ে বাড়ী ছিল না, একটি বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণ লইয়া কোন দেশে গিয়াছিল, বর-বধূ লইয়া খুব প্রাণ ভরিয়া আমোদ-প্রমোদ এবং পেট ভরিয়া চর্ব্বচোষ্য আহার করিয়া পরিতৃপ্ত সানন্দচিত্তে ঘরে ফিরিয়াই অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই সংবাদ পাইল, সে যেদিন বাহির হইয়াছে, সেইদিনই তার পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় এবং সে যেখানে গিয়াছে সেখানকার ঠিকানা তার পিতা ব্যতীত আর কাহারও বিদিত না থাকায়, তাকে সংবাদ দিতে না পারিয়াই তার অবিদ্যমানেই উহার মৃতদেহের সৎকারাদি করা হইয়া গিয়াছে, এখন তার জন্য বাকি আছে তাঁর শ্রাদ্ধ-শান্তি প্রভৃতি। সময় মধ্যে আর সাতটি দিন। যতটুকু আমোদ সে তার বন্ধু গৃহে লাভ করিয়াছিল, তার চতুর্ব্বিংশতি গুণ কি তাবও চেয়ে দশগুণ বেশী, মায় তার হারে সুদ গণিয়া দিয়া সে সেই বয়স হইতেই তার এই পিতৃত্যক্ত সংসারকে মাথা পাতিয়া লইয়াছে। এই সংসারের খরচ চালাইবার জন্য তাহাকে অসময়ে পড়া ছাড়িয়া দিয়া বাপের অফিসেই সাহেবদের ধরিয়া করিয়া একটি চাকরী জুটাইয়া লইতে হইয়াছিল। তখন মনে বড় বেশী ব্যথা বাজিলেও এখন অবশ্য তার ফল নেহাৎ মন্দ হয় নাই। যে এখন চাকরীর বাজার—এদিনে এম. এ. পাস করিয়াই বা কে একটা চাকরী পাইতেছে! সে তো তবু মরা বাপের সুপারিশে অমন একটা পাকা চাকরী এক কথায় পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবু······হইলে কি হয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের উপর মানুষের অন্তরে

অন্তরে এমন একটি সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে, শুধু খোরপোষের মূল্য দিয়া তার হিসাব কষিতে গেলে হিসাবখানার কসাইদেরও মায়া হয়। কোথাও কোন সাহিত্য সম্মেলন শুনিলে এখনও অনুকূলের মনটা অন্ততঃ দৌড়িয়া যায়, সব সময় অফিসের খাতিরে শরীরটা হয়ত নড়িতে পারে না। কলিকাতার ফুটপাথে পুরনো দরে যেসব বই মাসিক পত্রিকা বিক্রী হয়, মধ্যে মধ্যে সেই সবের মধ্যে হাতড়াইয়া দু পাঁচ খানা ভাল বইয়ের সে সন্ধান বাহির করে, নেহাৎ থাকিতে না পারিয়া ক্বচিৎ কখন তেমন কোন বিশেষ বিশেষ লেখক লেখিকার নূতন বই বাহির হইলে পাঁচ সাতবার অগ্রপশ্চাৎ করিয়া কিনিয়া বসে। পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে কোন ছেলে বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়াছে জানিলে নিজের কথা মনে করিয়া আজও অতি সন্তর্পনে একটি দীর্ঘশ্বাস সে মোচন করিয়া লয়—কিন্তু সেই দুঃখই যদি তার আসল দুঃখ হইত।

অনুকূলের বাপ ছিলেন একজন নির্ঝঞ্ঝাট নিরীহ ভদ্রলোক। বেশ একটু মোটা মাহিনাও তিনি পাইতেন, তাঁর সবকয়টি টাকা মায় ইনকাম ট্যাক্সের বাদ পড়া কয়েকটি আনা ও দুটি পাই পর্য্যন্ত তিনি মাসকাবারে তার সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী শৈলকামিনীর হাতে তুলিয়া দিয়া মাত্র অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি হিসাবের কড়ি ফেরৎ পাইতেন। বাকি প্রায় শ'দুই টাকা সমস্তই শৈলকামিনী তার খুশী খেয়ালে খরচ পত্র করিয়া মাসের শেষে দেনার জের টানিতেন। এছাড়া আরও টাকা পঞ্চাশেক কি করিতেন, সে খবর শুধু জানিতেন তিনি এবং প্রতি মাসকাবারে সহসাগত তাঁর একটি ছোট ভাই। নিজগৃহে তার পোষ্য বেশী নয়। শৈলর এক ছেলে, মেয়েও তার একটি। সে মেয়ে অনুকূলের বন্ধু, বিবাহ তার তাদের বাপের আমলে হইয়া গিয়াছিল, যদিও এই মেয়ের বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া অনুকূলদের বাপে ও মায়ে অনেক কাণ্ডই হইয়া গিয়াছে। শৈলকামিনীর সুতীক্ষ্ণ রসনার রসাস্বাদনে মধ্যস্থ করিতে আসিয়া পাড়াপ্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়াছে।

বিবাহসভায় বরের বাপ এবং ঘটকঠাকুরও যে ইহার কাংস্য কণ্ঠের সহিত অপরিচিত থাকিতে পারিয়াছিলেন তাও নয়; এমন কি কিছুদিন পর হইতেই জামাতা বাবাজীও শাশুড়ীর বাক্য যন্ত্রণায় শ্বশুরবাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছেন; কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া এদিকে শ্বশুরের সঙ্গে বা শালার সঙ্গে তাদের অফিসে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিত, এখনও করে। কি আশ্চর্য্য, ছেলেমেয়ে দুজনেই বাপের মত ঠাণ্ডাপ্রকৃতির হইয়াছে, মায়ের উগ্রতেজ তাহারা লাভ করে নাই। অনুকূল পিতার মৃত্যুর পর হইতে যথাসাধ্য মায়ের মন যোগাইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তার বাপের আকস্মিক মৃত্যুর ভিতরে কেমন যেন একটা জটিল রহস্য নিহিত আছে বলিয়া তার মনে হইয়াছিল। যেদিন তার বাপ মরে সেইদিনই ঘণ্টাকতক আগে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতর খুব বড় রকম একটা কোন্দল হইয়া গিয়াছিল, একথা সবাই জানে। শৈলকামিনী রাগের মাথায় ঠাকুরদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, "এত লোক রাঁড় হয়, আমার এবারকালের মাছভাত খাওয়া কি কোন জন্মে ঘুচবে না? কবে মিনসে চিতেয় উঠবে, কবে হবিষ্যির হাঁড়ি চড়াবো রে?"

উত্তরে নাকি অনুকূলের পিতা সংযম শান্তকণ্ঠে কহিয়াছিলেন, "তার জন্যে আর ভাবনা কি? যা চাচ্ছ তাই হবে।"

—এবং সেই রাত্রেই তাঁর বারকতক ভেদবমি হয়, ভোরের বেলা যখন শৈলকামিনী জানিতে পারিয়া ডাক্তার ডাকান তখন রোগীর জ্ঞান ঠিক আছে, কিন্তু নাড়ী একেবারেই নাই। 'স্যালাইন' দিবার তোড়জোড় করিতে করিতেই রোগীর প্রাণবায়ুটুকু বহির্গত হইয়া যায়। স্ত্রী তখন গভীর রোলে আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা অতি ক্ষীণ কিন্তু অতিশয় তীব্র একটা বিজয়ানন্দের হাসি তাঁর নীল ঠোঁট দুটিতে ফুটিয়া উঠিল; ডাক্তার তাঁর বন্ধু, তাঁকে বলিলেন, অনু দেশে নেই, তুমি থেকে শেষ ব্যাপারটা চুকিয়ে যেও।"

—আবার একটু নীরব থাকার পর দম লইয়া বলিলেন, "ও নেই ভালই হয়েছে, ওকে দেখলে যেতে কষ্ট হতো।" বলিতে বলিতে দু চোখ দিয়া দু ফোঁটা জল গড়াইয়া আসিল আর সঙ্গে সঙ্গেই দু চোখের তারা ঘুরিতে লাগিল।

—মায়ের কান্নায় আর ডাক্তারের কথায় অনুকূলের মনের ভিতরে-ভিতরে একটা যেন কিসের ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছিল;—কিন্তু না, তা হয়না—মিথ্যা এ সংশয়, তার বাবা তাঁর মাকে লইয়া ছাব্বিশ বৎসর ঘর করিয়া তবে মরিয়াছেন। যে বয়সে মানুষের আত্মমর্য্যাদা সদা সজাগ হইয়া থাকে, একটু অপমানের ইঙ্গিত সহ্য হয় না, সে বয়স তাঁর তো অনেকদিনই কাটিয়া গিয়াছিল, কাকতালীয় ন্যায়ের কথা তো আর এইমাত্র সৃষ্টি হয় নাই, ঐ সেই কবেকার কথা! নাঃ, সংসারটা এক বিচিত্র স্থান, কাঁদিয়া মাথা কুটিয়া ফেলিলেও এখানে কাহারও সাড়াটি পাওয়া যায় না, সে জিজ্ঞাসা করিবে কাহাকে?

চাক্‌রী হওয়ার পর বিবাহের পালা। মায়ের দারুণ শোক লাগিয়াছে, ইনাইয়া বিনাইয়া কত কথা বলিয়া বলিয়া তিনি স্বামীর জন্য রোজই দু একবার কাঁদেন। বিশেষ ছাইপিণ্ড হবিষ্যি লইয়া তো প্রত্যহই কাঁদিতে হয়। বলেন, "ওগো তুমি কোথায় আছগো, দেখে যাওগো, আঁশপাত না হলে যে আমার পেট ভরতো না গো—কতদিন যে কলকাতা থেকে ফেরবার সময় শ্যালদা থেকে ভেট্‌কি মাছ কিনে এনেছে গো। আজ আমি নিমপাতা ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছি দেখেও কি তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে না?"

কে জানে সেখানের কি ব্যবস্থা! দেখাই যায় কি না, তাই বা কে জানিতে পারে? তবে সত্যই যদি দেখা যাইত তাহা হইলে অনুকূলের মায়ের এই একদিনের ইপ্সিত ভোজন দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুকূলের পিতা ভেট্‌কিমাছের সওগাত পাঠাইতে অসমর্থতার জন্য দু:খীত অথবা দুর্ম্মুখী গৃহিনীর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারার জন্য আনন্দিত হইতেন তাহাও বলিতে পারা কঠিন। যাই হোক ফলে

অনুকূল, মায়ের জন্য ভেট্‌কিমাছ তো আনার উপায় ছিল না, ফুলকপি, কাবুলি-মটর, কাশীর পেয়ারা ও পাটনাই কুল প্রভৃতি কিনিয়া আনিতে লাগিল এবং ঐসব সুখাদ্য কাটাকাটি এবং রান্নার জন্য শীঘ্রই মায়ের একজন 'দাসী' আনিয়া দিল, অর্থাৎ কিনা একটি বছর বারো তেরোর মেয়েকে (তখনও সর্দ্দা আইন হয় নাই) বিবাহ করিয়া ঘরে পুরিল।

এইবার শৈলকামিনীর জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ হইল। যতদিন অনুকূলের পিতা বাঁচিয়া ছিলেন, অনুকূল ছিল ঝড় ঝাপটার বাহিরে, যাকিছু হইত ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর ভিতরেই হইত, তারপর বাপ মরার পরে অনুকূল এমন করিয়া মাকে জড়াইয়া রহিল এবং শৈলকামিনীও হঠাৎ এই ব্যাপারটায় এত বেশী ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন যে, অতবড় রুক্ষ মেজাজ তাঁর অশ্রুজলে গলিয়া অনেকটাই যেন ভেজা বালির মতই থসথসে হইয়া পড়িয়াছিল। রাগ বিশেষ করিতে হয় না, একটু আধটু যা অভিমান হয় তার জন্য ছেলেকে সামান্য একটু হয়ত গঞ্জনা দেন, সে প্রায় হাসিমুখেই সেটা সহ্য করিয়া লয়, সহজেই সব মিটিয়া যায়। বিশেষ তখন পরলোক প্রবাসী স্বামীর উদ্দেশে নালিশ-ফরিয়াদ পুরাদমে চলিতেছিল বলিয়া আর কাহাকেও বড় একটা দরকার হয় নাই। তিনি নাকি বাঁচিয়া থাকিয়াও শত্রুতা করিয়াছেন, মরিয়াও শোধ লইলেন।

নতুন বউ আসিল, খুব বেশী আদুরে মেয়ে, মা বাপের মরা-হাজা—ঐ সবে ধন নীলমণি। মা বলিয়া দিলেন মেয়েকে যেন উনানের কাছে যাইতে দেওয়া না হয়, আগুনকে তাঁর বড় ভয়, একটি ছেলে তাঁর প্রদীপের আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত এই জীবিত সন্তানটিকে অগ্নিদেবতার ত্রিসীমানাতেও যাইতে দেন না—এমন কি দিয়াশলাই-এর আস্ত বাক্সটাতেও সে কোনদিন হাত ঠেকাইতে পায় নাই। শৈলকামিনী বেয়ানের হুকুম শুনিয়াই মুখ বাঁকাইলেন, নির্ভীক সৈনিকের মতই সৎসাহসের সহিত যুক্তি খণ্ডন করিয়া দিয়া কহিলেন, "এ কথার কোন মানে

হয় না। মানুষ সেখানে যা বলে এসেছে সেই মতন তো তাকে যেতেই হবে। যদি ওর বরাতে তাই থাকে, কেউ কি রাখতে পারবে? সেই যে একটা রূপকথা আছে না,—এক রাজার গুরু, তার জন্মে ফাঁড়া ছিল, গঙ্গাস্নানে গিয়ে কুমীরের পেটে যাবেন। গুরুঠাকুর অগঙ্গার দেশে গিয়ে বাস করলেন, নদী ছেড়ে কখন একটা গাড়ুতেও জল ঢেলে পা ধোন না, অথচ এদিকে সময় হয়ে আসছে, নিয়তিতে টানতে লেগেছে; একদিন সেবারে অর্দ্ধোদয় যোগ, দেশ বিদেশের লোক যাচ্ছে গঙ্গাস্নান করতে, পৃথিবীর লোক আর কোথাও বাকী নেই, শুধু রাজার গুরুদেব বললেন, "আমি যাবো না।"

"কেন? কেন?" জিজ্ঞেস করতে করতে শেষকালে গুরু আসল কথাটি ভাঙলেন, "মহারাজ! যাবো কি আমার কুষ্ঠিতে আছে আমায় গঙ্গাস্নানের বেলায় কুমীরের গর্ভে যেতে হবে।"

শুনে রাজপুত্র বললেন, "এও কি আবার একটা কথা হলো! এত বড় যোগ, মানুষের কপালে এ ক'বার আসে? কোন ভয় নেই, চলুন আপনি। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করছি, গঙ্গাজলে দুদিকে কাঠের ঘেরা দোব, জলের দিকে আমি নিজে দাঁড়িয়ে হাত ধরে আপনাকে ডুব দেওয়াবো, কুমীর তো কুমীর, একটা মাছও আপনার কাছে গলতে পারবে না।"

এই না শুনে গুরু-গোঁসাই নিশ্চিন্দিমনে গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। রাজপুত্রও তাঁর কথামত সবই করলেন, নিজে জলের দিকে দাঁড়িয়ে গুরুঠাকুরকে আগলেও রইলেন; অবশেষে হলো কিনা যেই ঠাকুরমশাই জলে ডুব দিয়েছেন অমনি সেই রাজপুত্র,—আসলে তিনি গুরুঠাকুরেরই নিয়তি, আর এইজন্যই রাজার ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল,—হঠাৎ মস্ত বড় এক কুমীরের রূপ ধরে গুরুঠাকুরকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে গভীর জলে নিয়ে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কপালে থাকলে কেউ কি কিছু করতে পারে? আমার বাপের বাড়ী একটা ভিখারী গান

করতে আসতো—সে গাইতো, "যদি গো কপালে থাকে, ঘরের মধ্যে খায়গো বাঘে।" ওসব কিছু না—কপালই সব।

শৈলকামিনীর এমন বিশদ ও প্রাঞ্জল আধ্যাত্মিক বক্তৃতা তাঁর পুত্রবধূ এবং তাঁর জননী কেহই আমলেই আনিলেন না। অনুকূলের শাশুড়ী বেশ কড়াভাবেই জামাইকে শুনাইলেন, "পেটে যখন স্থান দিতে পারিয়াছেন তখন হাঁড়িতেও স্থান সঙ্কুলান করিতে পারিবেন, অতএব তাঁর কন্যা তাঁদের বাড়ীর রাঁধুনীর পদমর্য্যাদা বেদখল করিতে যাইবে না। ইচ্ছা হয় তিনি আর একটা বিবাহ করিতে পারেন।"

তাহাই হইল; সাধনকুমারী শাশুড়ীর ঘর করিল না, মায়ের ঘরেই রহিল। অনুকূল ইচ্ছা করিলেই অবশ্য আর একটা বিবাহ করিতে পারিত, তার মা তাতে খুব রাজী ছিলেন; দজ্জাল শাশুড়ী এবং সতীন বর্ত্তমান থাকা সত্বেও হিন্দুর ছেলের বিবাহ আটকায় না, এরও নিশ্চয়ই আটকাইত না; কিন্তু অনুকূল যতই নিরীহ হোক, মায়ের অনেক গঞ্জনা ও অশ্রুবর্ষণ নিঃশব্দে সহ্য করিল, তবু বিবাহ করিল না। ইতিমধ্যে অর্থাৎ এই বিবাহের বৎসর তিনেক পরে সাধনকুমারীর মা মারা গেলেন, তার বাপ অনতিবিলম্বে দ্বিতীয়পক্ষ সংগ্রহে ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না এবং সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সঙ্গে যে নতুন দিদিমা এ বাড়ীতে পদার্পন করিলেন, বড় আদরের আদরিনী সাধনকুমারীর সঙ্গে তাঁর যে দৃষ্টিবিনিময় হইল তাহাকে বিশেষ শুভদৃষ্টি বলা চলে না। সাধনকুমারী নিজের হাতে পত্র লিখিয়া অনুকূলকে ডাকিয়া আনিল এবং তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় স্বামীঘরে চলিয়া আসিল।

এ পর্য্যন্ত ঘটিয়াই যদি জীবনের গতি বেশ সহজ ভাবাপন্ন হইয়া চলিত, তাহা হইলে এই পরিবারের অল্প সংখ্যক লোক কয়টির জন্য কাহারও কোন কথা বলিতে হইত না; কিন্তু তাহা হইল না, জগতে বেশ সহজ স্বাভাবিক এবং সরল

পন্থা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেহই বড় একটা অবলম্বন করিতে পারে না। নানা রকমে জট পাকাইয়া জীবনকে প্রায় জটিল করিতেই ব্যগ্র হয়;—হয়ত ইচ্ছা করিয়া করে না; হয়ত শৈলকামিনীর দার্শনিক তত্ত্বই এর মূল, নিয়তিই এর কারণ, বিধাতাপুরুষ শূন্যে বসিয়া অদৃশ্য সুতাগাছি ধরিয়া থাকিয়া মানুষগুলাকে এমন করিয়া উল্টা নাচন নাচান! কে কি করিবে? না করিবার কি উপায় আছে?

শাশুড়ী মাতৃহীনা অবিচারিতা পুত্রবধূকে মায়ের মত অনায়াসেই বুকে টানিতে পারিতেন, তা পারিলেন না, বরং পা দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। সাধনা বড় শীঘ্র বড় বেশী আঘাত খাইয়াছে, অভিমানের আতিশয্যে মান-অপমান হিসাব করে নাই, বড় বেশী আশা করিয়া আপন ঘরে আসিয়াছিল; কিন্তু আসিয়া দেখিল আপন বলিতে তার কোথাও কিছু নাই। সেই যে কথায় বলে,—"যা লো যা, এখানে তোর সৎশাশুড়ী—ওখানে সৎমা,"—তার সেই হইয়াছে। শৈলকামিনী অনুকূলের গর্ভধারিনী মা হইলে কি হয়, অনেক সৎমাও তার মতন মার চাইতে ভাল। নিজের পেটের ছেলে বলিয়া তার সুখ দুঃখ এতটুকু মন দিয়া দেখার মত মন তাঁর নয়। ছেলের রোজগারের টাকা একটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া বুঝিয়া লইয়া যত সাদামাঠা খাওয়া পরা তাকে দিতে পারেন তা দেন। রান্না এ যাবৎ নিজেকেই করিতে হইত, যেই বউ ঘরে আসিল, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে রান্নাঘরে ঢুকাইয়া দিলেন; যুক্তি দেখাইলেন, "মা তো মরে গেছে, ভূত হয়ে তো আর দেখতে আসছে না, গরীব গেরস্থর ঘরে হেঁসেলে না ঢুকলে তো আর চলবে না, রাঁধো।"

সাধনকুমারী সাতজন্মেও রান্না করে নাই, কিসে কি দিতে হয় তাই জানে না তো কতটুকু দিতে হয় কেমন করিয়া জানিবে? জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে দেখান তো দূরের কথা, মরা মা তুলিয়া লাঞ্ছনার পরিসীমা থাকে না; আন্দাজে রাঁধিয়া রাখিলে ভাতের পাথর ঠেলিয়া দিয়া গালি পাড়িতে পাড়িতে উঠিয়া গিয়া

সাত পাড়ায় ঢাক বাজাইয়া ফিরিবেন। কষ্টের অবধি নাই। সাধনকুমারী রাগে দুঃখে অভিমানে স্বামীর সঙ্গে কথা কয় না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার চোখ ফুলিয়া ওঠে। অনুকূল নির্ব্বাক হইয়া ততোধিক দুঃখ ভোগ করে, ভরসা করিয়া তার দিক টানিয়া একটা কথাও বলিতে পারে না। একদিন একটা রাঁধুনী রাখার কথা বলিতে গিয়া যে কাণ্ড হইয়াছিল তারপর আর কোন কথায় থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

সংসারে দেখা যায় বড় বেশী বাড়াবাড়ি বেশীদিন সয় না, তা সে যেদিক দিয়া হউক একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেই। এদের সংসারেও তাই ঘটিল। সাধনার একটি মেয়ে হওয়ার মাস তিনেক পরেই সাধনার মা যে ভয়ে এ বাড়িতে তাকে ঘর করিতে দিতে নারাজ ছিলেন, তাহাই কি না অবশেষে ঘটিয়া গেল! হয়ত মায়ের প্রাণ আগে থাকিতে টের পাইয়াছিল! রান্নার আগুনে নয়; আলো জ্বালাইবার জন্য যে একটি বোতল হংস মার্কা কেরোসিন তৈল কেনা ছিল, ঐ অত্যাচারিতা অভিমানিনীর সহায়তা করিল সেই পুরা বোতলটি।

অনুকূল দিনকতক বড় বেশী কাতর হইল, এমন কি মায়ের মুখের ওপরই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া বসিল, "তুমি মা, তোমায় আর কি বলবো; তোমার জন্যই বাবা গেছেন, আবার তোমার জন্যই এটাও মলো—এবার আমি মলেই তোমার আপদ চোকে।"

অভিযোগটা সহজ নয়, সহজে এর নিষ্পত্তিও হয় নাই, মাস কয়েক মাতাপুত্রে কথা বন্ধ রহিল, অনুকূল কয়েক মাস কলিকাতায় গিয়া এক মেসে ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিল, মা তার কচি মেয়েটা বিলি করিয়া যাইবার জন্য অন্য লোকের দ্বারা বলাইলে সে অনায়াসেই বলিয়া বসিল, মেয়েকে সে অনাথাশ্রমে পাঠাইয়া দিবে। শুধু বলাই নয়, এর জন্য সে তোড় জোড়ও আরম্ভ করিয়া দিল এবং এই-খানেই জীবনে সর্ব্বপ্রথম আর হয়ত বা শেষ শৈলকামিনীর হার হইয়া গেল। কচি

মেয়েটা পেটের জ্বালা সহিতে না পারিয়া চিলের মত চ্যাচাইয়া মরিতেছিল ; দুধ ঝিনুক ন্যাকড়ার পলতে সব কিছু গোছাইয়া লইয়া মেয়ে কোলে তুলিলেন, বাড়ীর দাসীকে উপলক্ষ্য রাখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গিরি ! আবাগের বেটাকে বল, ওর যেথা ইচ্ছে চলে যাক, শৈলকামিনী যখন বেঁচে আছে, তার নাতনীকে সে মানুষ করতে পারবে ; কিন্তু এই আমি বলে রাখলুম, খবরদার যেন এ মেয়ের দাবী ও হতভাগা এঁ জন্মে আর না করে। ও যেন ভাবে এ ওর মেয়ে নয়।"

তারপর—নিরবধিকাল,—অনুকূলদের মাতা পুত্রের বিবাদ চিরস্থায়ী হয় নাই। বছর দুই বাদে এক গরীব গৃহস্থঘরের বয়স্থা কন্যা মলিনাকে সে আবার বিবাহ করিতেও ছাড়ে নাই। অবশ্য মায়ের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই সব পুরুষরাই যেমন আনে, অনুকূলও ঠিক তেমনিই মায়ের দাসী আনিয়াছে। মাও পূর্ব্বের ইতিবৃত্ত ভুলিয়া গিয়া নির্ব্বাচারে তাঁর নতুন পাওয়া দাসীকে লইয়া যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন, ঘরের লক্ষ্মী কল্যাণী বধূ তো তিনি চাহেন নাই, তাঁর কাম্য একটি বিনা বেতনের দাসী। তা এ মেয়েটিকে লইয়া সেদিকে কোন গোল বাধে নাই। নিতান্ত আবদারে-আদুরে নয় ; কষ্টসহিষ্ণু কার্য্যক্ষম শিক্ষাও আছে এ সবদিকে ; কাজেই ইচ্ছা করিলে তাকে ভালবাসিতে পারাও যাইত, অন্ততঃ ভাল ব্যবহার করিতে না পারিবার কোনও কথা নয়। অথচ স্বভাব তো যায় না। ঐ যে সাধন-কুমারীর মেয়ে আছে ; অনুকূলের দাবী ছাড়ান, নিজের সত্ব সাব্যস্ত হওয়া একমাত্র তাঁর নিজস্ব সেই যে মেয়ে,—তাঁর রক্তের কাছেও ঋণ আছে, তার উপর শিক্ষার তো কথাই নাই—কাজেই সে যে মেয়ে তৈয়ারী হইয়াছে তার তুলনা মেলা ভার ; আর না হয়ত ঐ ঠাকুমাটাই যতদিন আছেন ততদিনই মিলিবে, এর পর হয়ত খুঁজিলেও মিলিবে না। ঐ মেয়েকে উপলক্ষ্য করিয়া যত রকমে পারা যায় শৈলকামিনী তাঁর বউ ছেলেকে ব্যতিব্যস্ত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। মলিনা ছোটছেলেমেয়ে ভালই বাসে, আপনার ইচ্ছাতেই সে সতীনঝিকে

যত্ন করিতে যাইত। কিন্তু ফলে হিতে হইত বিপরীত। সেলাই বোনা তার হাতের মন্দ নয়। একটা ব্লাউস মেয়েকে সেলাই করিয়া দিল, মেয়ে সেটা দু আঙুলে ধরিয়া ঠাকুমার কাছে লইয়া গিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "মেগো! এই জামা আমায় দেওয়া কেন বাপু! নিজের কত কাজকরা ভাল ভাল জামা আছে, আর আমি একটা চেয়েছিলুম বলে এই!"

ঠাকুমা ক্রোধে কপিশবর্ণ ধারণ করিয়া হাঁকিলেন,"দে, দে, দে বলছি পুকুরে ফেলে দে। ওঃ অমন অচ্ছেদ্দাব ন্যাকড়ারত্তি হাত পেতে নিলি কোন আক্কেলে লা, শতেক খোয়ারি! লজ্জা করলো না নিতে!"

এইটুকুই কি! জামা না হয় পুকুরে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; তা ভাসুক, কিন্তু বউ-ছেলে দুজনকারই যে এ লইয়া শতেক রকমেই খোয়ার হইল তা বলাই বাহুল্য। অবশেষে মলিনার ট্রাঙ্ক খোলাইয়া তার সবচেয়ে দামী ব্লাউসটা তারই হাত দিয়া বাহির করাইয়া সেটা দর্জিবাড়ী হইতে কাটাইয়া যখন তাঁর আহ্লাদীর গায়ে পরানো হইয়া গেল তখন এর জের মিটিল। কিন্তু খোঁটা গেল না। চুল মলিনাই বাঁধিয়া দিত; কিন্তু যত কাজের ভিড়ই থাক সে চুল বাঁধা কোনদিনই এক বারের বাঁধায় চুকিত না। যেদিন যেমন করিয়াই বাঁধা হোক না কেন, আহ্লাদী খোঁপায় হাত দিয়া রাগিয়া কাঁদিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া ঠাকুমাকে নালিশ করিতে যাইত। তিনি আসিয়া মলিনাকে যাচ্ছেতাই করিলে তবে আবার নতুন খোঁপার পত্তন পড়িত, অমনি যদি আবার পুনরনুরোধ করা হইত, তাহা মঞ্জুর হইত না।

মেয়েটি তৈয়ারী হইতেছিল একেবারে অজ পাড়াগেঁয়ে এবং অশিক্ষিত, যেমন নিতান্ত মূর্খ নিচু শ্রেণীর বাড়ীতে হয়। মলিনার ইচ্ছা হইত সে ইহাকে একটু মানুষ করিয়া লয়, নতুবা এর পরে তো তাদেরই দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু দুদিন পরেই সে বুঝিল দুর্ভোগ যা তা এখনই বড় কম নাই, ভবিষ্যতের কথা

ভবিষ্যতে, এখন বর্ত্তমানকেই সামলান দায় হইয়া উঠিয়াছে। এ মেয়েকে সৎ-শিক্ষা দেওয়া সে তো সে, তার চতুর্দ্দশ পুরুষের সাধ্যও নাই। ছল কাপট্যে সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বাড়ীতে ভিখারী আসিলে মেয়ে হাঁকিয়া বলিল, "ওষুধ হয়েছে, ভিক্ষা দিতে নেই গো, যাও।"

মলিনা কুণ্ঠিত হইল, এমন ডাহা মিথ্যা কথা এই বয়সে, আর এখন যদি দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিলে মন না কাঁদে তবে আর কি কখনও কাঁদিবে? বলিল, "যাও না মা, এই চাল ক'টি দিয়ে এসোগে না, কত আশীর্ব্বাদ করবে। গরীব ওরা খেতে পায় না।"

মেয়ে মুখ ভেংচাইয়া জবাব দিয়া যেমন তেমনি বসিয়া রহিল, বলিল, "তোমার বাবার পয়সার চাল দুহাতে বিলিও, আমার বাবার পয়সা এত সস্তা নয় যে, গরীব দেখলেই ভাঁড়ার লুটিয়ে দিতে হবে। কথাগুলি অবশ্য উপযুক্ত স্থানেই শেখা। এ কথা শৈলকামিনী যখন তখন তাঁর পুত্রবধূদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, শুধু বদল হয় ঐ শব্দটা অর্থাৎ বাবার বদলে বেটা।

ভাত খাইতে বসিয়া পাতে যদি এত কটা ভাত পড়িয়া থাকে, গরুর ডাবায়, ফেলিবার জন্য লুকাইয়া কুড়াইতেছে, কোথা হইতে ঘৃতদুগ্ধ-পুষ্ট নধরদেহ দোলাইতে দোলাইতে সাত বছরের আহ্লাদী ছুটিয়া আসিল। আর রক্ষা নাই! "হ্যাঁ বউ অত যে ভাত ফেলা হচ্ছে! বাপের বাড়ী থেকে পয়সা আসে, না? কত ধানে কত চাল তা জানো? ঠাকুমা দেখে যাও একবার তোমার গুণের বউয়ের কাণ্ডকারখানা।"

মানুষ যে কথায় বলে, "সতীনের চাইতে সতীন কাঁটার জ্বালা বেশী।" মলিনা সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। শাশুড়ী আর সতীনঝি এ দুদিক দিয়া যেন দুজনে তাকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারিতেছে। একজন হইলে মানুষ সামলাইতে পারে, কিন্তু কোন্ দিক দিয়া কখন যে আক্রমণ হইবে কিছুরই তো স্থিরতা নাই, দিনরাতই

চলিতেছে। অত মেয়ে—পড়াশোনা নাই, কাজকর্ম্ম নাই—কেবলই পাড়ায় পাড়ায় ইতরভদ্র সমজাতীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া যত রকমারী খেলা আছে সেই সব রকম খেলা এবং প্রহরে প্রহরে বাড়ী আসিয়া খাইয়া যাওয়া এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে সৎমায়ের ক্রটি বিচ্যুতির ছুতা ধরিয়া ঠাকুরমার মনে আগুন ধরাইয়া দিয়া সরিয়া পড়া, এই তার সবসুদ্ধ কাজ। সেই আগুনে লঙ্কাদাহ হইতে থাকে, সে পরম স্ফূর্ত্তিসহকারে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। বাড়ীটা যে নিঝুম হইয়া থাকে বোধ করি সেটা তার ভাল লাগে না। হাজার হোক ছেলেমানুষ কিনা—উদ্যম ও অধ্যবসায়ের প্রতি একটা টান আছে তো!

অনুকূল তার প্রথমা স্ত্রী সাধনকুমারীর পরিণাম ভুলিতে পারে নাই। বিবাহ সে করিয়াছে—সাধনের চাইতে স্বভাবগুণে মলিনাকে হয়ত পছন্দও করে বেশী, কিন্তু সেই দুর্ভাগিনী যাকে তার মা মায়ের কর্ত্তব্য করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে শেখান নাই এবং শ্বশ্রূমাতা তাঁর ভাগের কর্ত্তব্যটার পরিবর্ত্তে অ-কর্ত্তব্যই করিয়া বসিলেন, তারপর অনুকূলের পক্ষ হইতে তার স্বামীর কর্ত্তব্যের ত্রুটিটাও তো বড় কম হইল না। এই তিনজনের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের অনবধানতার ফলে তাহাকে তার আশাতৃষ্ণাভরা সেই নবীন যৌবনে যে অমন করিয়া মরিয়া বাঁচিতে হইল, এ দুঃখটা বাস্তবিক তো ভুলিয়া যাইবার মত সহজ ব্যাপার নয়! মলিনা তাকে সত্য সত্যই যত্ন করে অবশ্য শাশুড়ীর ভয়ে যতটা করিতে পারিত তা করিবার উপায় ছিল না,—তবু অনুকূল যতটা পায় সেও তার পক্ষে ঢের। তার মনে হয় সাধন পারে নাই, কিন্তু এত প্রতিকূলতার মধ্যেও মলিনা তাকে সত্য করিয়া ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে। ভাল না বাসিলে মানুষ সহ্য করিতে পারে না, একমাত্র ভালবাসাই তাকে আত্মবিলোপ করিতে শিক্ষা দেয় তারই ফলে আত্মভিমান আপনা হইতেই পরাস্ত হইয়া সরিয়া বসিয়া থাকে। অনুকূল মনের মধ্যে যেন খানিকটা সান্ত্বনা পায়। পুরুষ মানুষের বহু বিবাহের পথ খোলা

আছে, অবশ্য সেটা দেশাচারে, তাই সে মায়ের আদেশকে অজুহাত করিয়া বিবাহ করিয়াছিল, কমবয়সী পুরুষের পক্ষে গৃহ শূন্য রাখিলে মর্য্যাদায় বাধে, তাই একদিক দিয়া মনের মধ্যে তার বিলক্ষণ একটা অস্বস্তিবোধ ছিল যে, সাধনের মত মলিনাও হয়ত একদিন তার মায়ের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ কাটিয়া বসিবে? তবে উপায় কি! বউ হিন্দুর ঘরে সস্তার মাল, সে না হয় বদলাইল, মা তো তার একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর তো রদবদল নাই। এক একবার ভরসা হইত যদি বা ঠেকিয়া একটু শিক্ষা হইয়া থাকে!—হরিবোল হরি!—দুদিন গিয়া তিনদিন পড়িতেই জানা গেল যথাপূর্ব্বম্ তথা পরম্—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না! মা সেই সনাতন মা-ই আছেন, বধূর শতবার পরিবর্ত্তন হইতে হয় হোক, তিনি কিসের দুঃখে বদলাইবেন?

নতুন বউকে প্রথম দিন লইতেই হুমকি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "বলে বেঁচে থাকুক চূড়া বাঁশী, কত শত মিলবে দাসী!" বড় যে দাদ তুলতে আগুন খাকী আগুন খেয়ে মলেন, ক্ষেতিটা হলো কার? আবার ইনি যদি সোহাগ কাড়াতে গিয়ে আফিং খেয়ে মরেন, আবার একটা আন্‌বো ওর জন্য হয়েছে কি?

শুনিয়া ঈষৎ একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস মোচনপূর্ব্বক মলিনা মনে মনে ভাবে, "তাই তো, ক্ষতিটা কার? রক্তবীজের ঝাড়ের মত বউ একটা মরিলেই যখন তার শূন্যতা পূর্ণ হইতে দেরী হয় না, তখন মরিয়া লাভ? সতীন বেচারী নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল, সে হয়ত ভেবেছিল, জীবনে যে দুঃখ সে পাচ্ছে, মরে তার শোধ নেবে, এদের জীবন ভার হয়ে উঠবে, সংসার হবে অচল! অবোধ! অবোধ! তাই কি কখন হয়? একি হিন্দুর ঘরের বিধবা? যে দেশে এখনও বিদ্বান পণ্ডিত লোক পর্য্যন্ত "পুত্রপিণ্ড প্রয়োজন" এই আত্মছলনা দ্বারা বশীভূত হইয়া পরিণত বয়সেও এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য কুমারীর পাণি গ্রহণে সমর্থ, তাদের সংসার অচল করিবে ওই একটি সামান্য মেয়ে সাধনা? বোকার মত মরিয়া নিজেই জব্দ হইল।

নিজেকে বঞ্চিত করিয়া কন্যা স্বামী ঘরসংসার সব পরের হাতে তুলিয়া দিল। আর কার কি ক্ষতি? মলিনা নিজের মনকে শুনাইয়া মনে মনে বলিল, "আমি তা বলে মরছি না, যতই উনি বা ওঁর নাতনী হাড় জ্বালান, মরা অমনি পড়ে আছে কি না…অগতিতে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে গেলুম কেন?"

একদিন অনুকূলের কাছে কথায় কথায় বলিয়াও ফেলিল, "রাগ করে মরার মত বোকামী আর নেই; জব্দ আর কে হয়, যে মরে সেই হয়।"

অনুকূল শুনিয়া যে নিশ্বাসটা ফেলিল তাতে শোকের সঙ্গে সান্ত্বনারও আভাস ছিল।

কিন্তু মলিনার সকল চেষ্টা সব শিক্ষাই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। যত বয়স বাড়ে—মানুষ একটু বেশী করিয়াই খিটখিটে হয়। যে আগে হইতেই ছিল তার তো কথাই নাই। শৈলকামিনী দিনেকের দিন যেন অসহনীয় হইয়া পড়িতেছেন। দিন নাই, রাত নাই, গলা জাহির করিয়াই আছেন, মলিনার সন্তান হইবার সম্ভাবনা হওয়া পর্য্যন্ত আরও যেন তাঁর মনের মধ্যে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। শরীর তাঁর ভাল থাকে না। অনুকূল একটা রান্নার লোক রাখিতে বলিয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা খাইল, কিন্তু এবারে সে তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া নিজেই একটা লোক জুটাইয়া আনিল। আর রক্ষা আছে! শৈলকামিনীর মুখের তোড়ে রাঁধুনী তো পলাইয়া গেল, মলিনা—যে সহজে গায়ে মাখে না—সেও সেদিন না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। এইবার এতদিন পরে মায়ে পোয়ে সম্মুখ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনুকূল বলিল, "একটাকে এই করে মেরেছ, আবার এটাকেও কি মারতে চাও, তাই, স্পষ্ট করে বলো, পুলিস আদালত করতে হবে না, চুপি চুপি নিজেই গলাটিপে শেষ করে দিই।"

অগ্নি উর্দ্ধশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। "বউয়ের হয়ে আমাকে অপমান? এরই জন্য তোকে পেটে ধরেছিলুম? এর চেয়ে পেটেই কেন মরিসনি?" এই বলিয়া

শৈলকামিনী যে হুহুঙ্কার ছাড়িলেন আগে হইলে অনুকূল তাহাতে বিলক্ষণ ভয় পাইয়া যাইত। আজ সে কিন্তু মায়ের গর্জ্জন গ্রাহ্য করিল না, বলিল, "সে হলে ভালই হতো। অনেক অনর্থ তাহলে এ সংসারে বন্ধ থাকতো মা! তোমার আমায় মিলে অনর্থক অনেকগুলো পাপের ভাগী হতে হতো না, কিন্তু তা যখন হয়নি তখন খেদ করে তো আর ফল নেই; এখন এর একমাত্র এই উপায় আছে যে, বার বার পরের মেয়েদের না মেরে এবার আমি নিজেই মরি।"

বলিতে বলিতে হঠাৎ অনুকূলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কথা তার অশ্রুবাষ্পে সজল হইয়া আসিয়াছিল, জোর করিয়া সেই সহসা-উদ্গত দুর্ব্বলতাটাকে দমন করিয়া লইয়া সে পুনশ্চ জোর গলায় বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, এবার আমি না মলে তোমার হবে না। আমার পক্ষেও যেন এ পৃথিবী ক্রমশঃ ভার হয়ে উঠছে। আমিও আর সইতে পারছিনি, এক একবার ভাবি কোথাও না হয় চলেই যাই, কিন্তু আবার এই যে সাধের শেকল পায়ে বেঁধেছি, নির্লজ্জ বেহায়া, একবারের কাণ্ডে জ্ঞান হয়নি, ফের সেই মহাপাতক ফিরিয়ে করেছি, তাই পারি না। কিন্তু ওর কপালে যা আছে হোক, আমি আর সইতে পারছিনি। বাবাকে তুমি মেরেছ, এবার আমাকেও মেরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। কোন জ্বালা তোমার থাকবে না।"

শৈলকামিনী এ কথার পর আর একটি কথাও কহিলেন না। এমন কি একটিবার মুখটা পর্য্যন্ত তুলিতেও তাঁকে দেখা গেল না, যেমন দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া ছেঁড়া চুলের বিনানী বিনাইয়া আহ্লাদীর জন্য খোঁপা বাঁধার দড়ি তৈয়ারী করিতেছিলেন, তেমনই করিতে লাগিলেন। সেদিন রবিবার ছিল, অনুকূল না খাইয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া রহিল।

অনেক বেলায় সাধ্যসাধনা করিয়া মলিনা অনুকূলকে ভাত খাওয়াইল, শৈলকামিনীর সেদিন একাদশী ছিল, খাওয়া ছিল না। আহ্লাদী বাপের ত্রিসীমানায় তো থাকে না, বাপ বাড়ী থাকিলে সেদিন সে সারাদিনটা পাড়াতেই কাটায়,

সেদিনও এক দমকায় বাড়ী ফিরিয়া ভাত খাইয়া আবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। মলিনা সব কাজকর্ম্ম সারিয়া দুইটা মুখে দিয়াই পুকুরঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল। শাশুড়ীর জল বাটনা সব তাকেই তো করিতে হয়। একাদশী করিয়া আছেন, রাত পোহাইলেই মুখে জল দিবেন তো।

রাত্রে শাশুড়ীর পায়ে তেল মালিশ কবিতে গেলে অন্যদিন শৈল কথায় কথায় তাকে ঘা মারেন, আজ একটি কথাও কহিলেন না, তেল দিতে বারণও করিলেন না। মলিনা একটু বিস্মিত হইল, তার মনে একটু কষ্টও হইল, যে ছেলে কখন একটা কথা বলে না সে আজ মায়ের অন্তঃস্থলে বড় নির্ঘাত আঘাত দিয়াছে।

ভোরবেলায় পুকুরঘাটে গিয়া ওপারের বাড়ীর পাট-করনী বৌ ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে ডাকাডাকি করিয়া বলিতেছিল, "অনুকূল দাদাবাবুর মা কেন জলে ভাসছে গা ?"

একালের সাবিত্রী (?)

[সেসন কোর্টে বিচার বসেছে...ডাকাতির মামলা...জুরীরা মুখ ভার করে শুনছেন...জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি...লোক খুন...সেই বাড়ীর এক পুরনো পিস্তল পাওয়া গিয়েছে এক তরুণ বাঙালীর কাছে...সরকারী উকিল অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন, সেই বাড়ীতে এই তরুণ আসামীর যাতায়াত ছিল...অতএব রীতিমত এটি স্বদেশী ডাকাতি। সাক্ষী সাবুদ সবই নেওয়া হয়ে চুকে গিয়েছে... আসামী দেখছে তার সামনে ফাঁসীর দড়িটা ঝুলছে...ক্রমশ এগিয়ে আসছে...কিন্তু হঠাৎ...ফাঁসীর দড়ির বদলে এলো সেই বাড়ীরই এক তরুণী...কুমারী...কিন্তু আজ তার মাথায় লালটকটকে সিঁদুর ঢালা !

কি ব্যাপার ?

আদালত উঠলো চমকে...

বিচারক নতুন করে লিখতে আরম্ভ করলেন রায়...ইতি মধ্যে আপনারা শুনে নিন্ মামলাটা—]

শহরের সেসন কোর্টে একটা খুনী মামলার বিচার চলিতেছিল। মামলাটা শুধু খুনেরই নয়, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত ছিল একটি বেশ বড় রকমের স্বদেশী ডাকাতি ! যদিও ইদানীং এটা স্বদেশী ডাকাতির যুগ নয়, সে সব দিন এখন তার অতি-নিকট বর্ত্তমানতা হইতে একটুখানি দূর অতীতের দিকে পশ্চাদ্‌বর্ত্তন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্টায় স্থানলাভ করিতে 'কিউ' দিয়াছে, তথাপি নাকি বহুকালের বহু

অনুসন্ধানের ও তত্ত্বাবধানের ফলে দেশের পুলিস কর্ম্মচারীরা এই সদ্য অনুষ্ঠিত দস্যুবৃত্তিটির মধ্যে একটা অতীত দিনের পুরাতন সম্পর্কের সংযোগের সূক্ষ্ম সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই জেলার ভিতরেই অবস্থিত বিরাম-বাগের জমিদার বাড়ীতে। শিব চতুর্দ্দশী বা তার পূর্ব্ব রাত্রে একদল ডাকাতের অকস্মাৎ মধ্যরাত্রে বাড়ী চড়োয়া হওয়াতে। ডাকাতেরা নাকি দলে বেশ ভারীই ছিল এবং তাদের মধ্যে বোধ করি কোনরূপ প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার বালাই ছিল না। বাঙালী, বেহারী, এমন কি দশবিশজন সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত ঢাকা-দেওয়া সালোয়ার ও মাথায় বিশেষ ফ্যাশনের পাগড়ীপরা পেশোয়াবীকেও দেখিতে পাওয়া গিযাছে। তবে এই মামুলী ডাকাতিকে সর্ব্ব-ভারতীয় স্বদেশী ডাকাতি রূপে সনাক্ত করা হইল কেন? এই প্রশ্নোত্তরে উকিল সরকার যতগুলি সুনির্দ্দিষ্ট কারণ প্রদর্শন কবিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধানতম এই কযেকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম কথা এই যে, ডাকাতেরা বাড়ীর দরওয়ানদের পায়ের প্রতি লক্ষ রাখিয়া হাতেব গাদা বন্দুকের গুলিতে তাদের খোঁড়া করিয়া দিয়া সঙ্গেব মইয়ের দ্বারা উপরতলায় অনায়াসে পৌছিলে সমস্বরে "জয় মা কালী" না বলিয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি কস্মিনকালেও পেশাদার ডাকাতদের 'ওয়ারক্রাই' বা বিজয়ধ্বনি ছিল না। আবহমান কাল ধরিয়াই নাকি তারা সব মহাকালীর উপাসক, তার সাক্ষী এদিকে সেদিকে আজও বহু দেশ দেশান্তরে, জঙ্গলে বনে ভগ্ন ও অর্দ্ধ ভগ্ন মন্দিরে দেউলে, তাদের উপাসিত মা কালীর আস্ত ও ভাঙ্গা মূর্ত্তি ডাকাতে কালী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে। ডাকাতেরা তাঁদের ত্যাগ করিয়াছে, গ্রামের লোকে চাঁদা করিয়া কোথাও বা পূজা দেয়, কোথায়ও বা দেয় না। যারা দেয়, খবর লইলে জানা যাইবে, প্রাচীন প্রথা মত "জয় মা কালী" বলিয়াই দেয়। "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চীৎকার করে না, ও প্রথা কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। আর বিচার করিয়া দেখিতে

গেলে সহজেই বুঝিতে পাবা যায় যে কেনই বা তাহা থাকিবে। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নিতান্তই আধুনিক সৃষ্টি, কোন প্রাচীন প্রথাই নয়। এই শব্দে যাঁহাকে বন্দনা কবা হয় তিনি কালী নহেন, এমন কি দশমহাবিদ্যাব অনুবর্ত্তিনী কেহই নহেন। তারা, ধূমাবতী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, বগলা, কমলা, ভৈরবী, মা নহেনই, ছিন্নমস্তাও নন। তা যে নন তাব যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্বদেশী যে সব স্বদেশী গান গভর্ণমেন্টের আদেশে প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই "বন্দেমাতবম্" মন্ত্রেব বন্দনীয়াব বহু পবিচয় দেওয়া আছে, তাদেব সঙ্গে পূর্ব্ব-পবিচিতদেব অবয়ব সাদৃশ্য দেখা যায় না, আদৌ মিল ঐ সব সঙ্গীতেব কোন কোনটিতে দেখা যায় বলা হইয়াছে।

"বাংলাদেশেব হৃদয় হ'তে কখন আপনি,
এই অপরূপ রূপে দেখা দিলেন জননী।"

মহা বিদ্যাগণ বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পত্র তাঁদের কুলপঞ্জিতে লিখিত মাত্র নাই, তাঁবা সমুদয় ভারতবর্ষ পর্য্যটন কবিয়া ফিরিতেছেন, শুধু বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীনিবদ্ধা নহেন। এদেব মধ্যে অন্যতমা ছিন্নমস্তা দেবীব বিখ্যাত মন্দির ছোটনাগপুবের পর্ব্বতারণ্য সঙ্কুল প্রদেশের প্রান্তভাগে 'বাজরূপা' নামক মহাপ্রতাপের সানুদেশে দামোদর এবং ভেবা নামক নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। যদিও শক্রুস্তম্ভনের জন্য বগলামুখীব ও অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ এবং দস্যুবৃত্তিতে সাফল্য লাভের জন্য কালিকা দেবীব তন্ত্রোক্ত পূজো-পাসনাদির বিধি বঙ্গদেশেও প্রবর্ত্তিত ছিল এবং আছে, তথাপি এমন কথা বলা চলে না যে বাংলাই একমাত্র দেশ যেখানে এই তান্ত্রিক পূজা সীমাবদ্ধ। কিন্তু একথা আমি জোর কবিয়া বলিতে চাই যে "বন্দেমাতরম্" শব্দ বাংলা দেশের বাহিরে পৃষ্ট অথবা পুষ্ট হয় নাই। ইহা বঙ্গদেশস্থ লেখকের স্বকপোলকল্পিত নব যুগের জন্য নতুন সৃষ্টি। শোনা যায় পুষ্পাঞ্জলিকার বঙ্গীয় লেখক তাঁর গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ঐ

মন্ত্রের বীজ বপন করিয়াছিলেন। বাহান্নপীঠ সমন্বিত সতী দেহরূপে মহাভারতের পরিকল্পনা তিনিই তাঁর শিক্ষিত শিষ্যবর্গের উর্ব্বর মস্তিস্কে প্রবিষ্ট করান, ক্রমশ সেই বীজ অঙ্কুরিত চারাগাছ ঐ "বন্দেমাতরম্" রূপে মহামহীরূহে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক "অধিভারতী মূর্ত্তি" পরিগ্রহ করিয়া তেত্রিশ কোটীর উপর সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া বসিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, যে দেশে তেত্রিশ কোটি দেববাদ অপ্রতিবাদে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিয়াছে সেখানে একাধিকে ক্ষতি কতটুকু? শীতলা, মনসা, ঘেঁটু, চণ্ডিকা সবাই যদি পংক্তি-ভোজনে আসন জল পাইয়াছেন, ইনিই বা অপাংক্তেয় হন কিসে? বোঝাব উপর শাকের আঁটি বিশেষ ভারাক্রান্ত না করাই সম্ভব। কিন্তু আপনারা অবহিত চিত্তে জানিয়া রাখুন, কথা তা নয়। এই "বন্দেমাতরম্" শব্দটি শুধু শব্দমাত্রই নয়; ইহা একটি শব্দভেদী বান। এই শব্দে মেধাবী ছাত্র স্কুল ছাড়িয়াছে, কলেজ ছাড়িয়াছে, সিভিল সার্ভিসের দেবগন্ধর্ব্ব-কাঙ্ক্ষিত সর্ব্বসম্পূজিত চাকুরী ছাড়িয়াছে, চাকুরীজীবী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, কুলকন্যা গৃহবধূ কারাবরণ করিরাছে, বিপক্ষপক্ষ বক্ষকম্পনকারী উকিল ব্যারিষ্টার সহস্র সহস্র মুদ্রাব বাঁধা ফি ছাড়িয়াছে, কোন কবদ কিম্বা স্বাধীন রাজা রাজ্য ছাড়িযাছে কিনা সঠিক বলিতে পারি না, এ ছাড়া আর কে আর কি ছাড়ে নাই! অতএব ঐ নতুন নারী দেবতার পূজামন্ত্র নিশ্চিত জনসাধারণের পক্ষে সাক্ষাৎ অরিমন্ত্র, এ মন্ত্রেব সাধনে ইষ্টলাভ দূরে থাক, অনভিষ্ট অনভিপ্রেত বিপৎপাতই ঘাটিয়া থাকে। ঐ দেবীমূর্ত্তি কোন স্বর্গমোক্ষদান করেন বলিয়া ইহার মন্ত্রসাধনের কোনরূপ কলশ্রুতি শোনা যায় না। বরং ঐ মন্ত্র পরলোকের পথে কণ্টকারোপনপূর্ব্বক পরলোক বিশ্বাসী সরল প্রাণ বাঙালীকে তথা বাঙ্গালীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত ভারতবাসীকে পারলৌকিক দৃষ্টি বিভ্রান্ত করিয়া ইহলৌকিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। এই মূর্ত্তি বিপদের দেবী, বিপ্লবের অনুচরী, আমরা দেখিতে পাই—

আপনাদের সাক্ষাতেই দর্শন করুন! হাতের কব্জিতে মেয়েদের মত একটি অলঙ্কার ইহারা পরিধান করিতে না পাইলে বাঁচে না, পূর্ব্বে পুরুষে চেন লাগাইয়া ঘড়ি পরিত। এখানকার নতুন দৃষ্ট তরুণেরা বালা লাগাইয়া পরে! আসন্ন মৃত্যু যাহার সম্মুখে করাল বদন ব্যাদিত করিয়াছে, তেমন সময়েও এই সকল তারুণ্য-ঘটিত ব্যবস্থাগুলির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে নাই, আপনারা স্বচক্ষেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন! এই যে উৎকট বে-পরোয়াভাব, 'কে কার করি ধারে' অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"রিক্ত যারা সর্ব্বহারা সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।"

এই ভাবটাই আদত স্বদেশিকতা। এদের গুরুময় ঐ অবিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতের জগাখিচুড়ি ঐ সর্ব্বনেশে ধ্বনি "বন্দেমাতরম্" আমি ভূদেব চরিতে পড়িয়াছি, তিনি তবু এই মন্ত্রকে খাঁটি সংস্কৃতে লিখিয়া একে সার্ব্বজনীন করিতে ইতস্তত করিয়াছিলেন। "মাতর্ণমামি সততং সতীদেহ রূপাং" ইত্যাদি কজনারই বা কর্ণগোচর হইয়াছিল? আজকাল টোল, টিকি ফ্যাশন বহির্ভূত হইয়াছে, সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক নাই, সে জন্য কানে পৌছিলেই বা "মাতর্ণমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থাং" প্রভৃতির অর্থবোধ করিয়াছিল কয়জনে? কিন্তু এই বাংলা শব্দে অল্পকাল মাত্র বিগত অতীতে একদিন গগন পবন মুখরিত হয় নাই কি? সাম্রাজ্যতরি টলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিনা? আমার বলিবার কথা এই যে, সেই দারুণ দুর্যোগকে বহু গবেষণা ও অনুপ্রেরণায় ইদানিং কথঞ্চিৎ আয়ত্তাধীন করা হইয়া আপাততঃ দেশবাসীর ধনপ্রাণকে কিঞ্চিৎ মাত্রায় নিরাপদ করা হইতেছে, এদিকে পশ্চিমাকাশ ভয়াল কাল মেঘাচ্ছন্ন, পূর্ব্বাকাশেও মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুদ্বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক এমন সময়ে আবার ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন আমরা কোন মতেই ঘটিতে দিতে পারি না। বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরোদ্গমেই সমূলে উৎপাটিত করা

অত্যাবশ্যক। বিরামবাগের জমিদারগৃহের ডাকাতেরা উচ্চনাদে "বন্দেমাতরম্" বলিয়াছে। বিরামবাগের ডাকাতদের মধ্যের মৃত দস্যুর কেশ পারিপাট্য ও বস্ত্র পরিধানের কায়দায় ঠিক আমাদের সম্মুখস্থ কাঠগড়ার আসামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপেই এক, মায় রিস্ট ব্যাণ্ড এবং পায়ের কাবুলী চপ্পল জোড়া পর্য্যন্ত। স্বদেশী এবং ছাত্র ডাকাত ব্যতীত তাহাকে অপর কোন আখ্যা দেওয়া কোন মতেই চলিতে পারে না।

ইহার পর সরকার পক্ষের প্রসিদ্ধ ও প্রবীন উকিল এই মকর্দ্দমার অপরাপর বিষয়গুলিও যথারীতি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় ও ভাবে বিচারাসনে উববিষ্ট জজ এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী জুরি অষ্টককে বুঝাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া ঐ রাত্রের ব্যর্থ ডাকাতির অভিনয়ের মধ্যে বিরামবাগেব জমিদার প্রবল প্রতাপান্বিত ৺বরুণ রায়ের পুত্র করুণ রায় এই আসামীরই মত একজন বঙ্গবীরের চোরাই পিস্তলের গুলিতে আহত এবং নিহত হন, এই আসামীর সহিত তাঁহার কি সুত্রে কিরূপ সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল এবং এই আসামী নিজের কলিকাতার মেসের বাসায় বসিয়া কোন কোন্ শাসন বাক্য তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিল এবং সেই সকল কথা দৈবক্রমে কাহার কাহার কর্ণগোচর হইয়াছে। তাহার মেসের চাকর কবে তার সঙ্গে একজন হিংওয়ালা কাবুলিওয়ালাকে হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে দেখিয়াছিল। নিতান্ত কৈফিয়ৎ দিতে অপরাগ অনাবশ্যক কারণে বিরামবাগের উক্ত ঘটনার কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে এই আসামীর মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য যাতায়াত, এমন বহু সন্দিগ্ধ বিষয় সম্পর্কে তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার দীর্ঘ বক্তৃতা কতক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল বলা যায় না। কারণ কাঠগড়ায় কাষ্ঠাসনে আসামী ততক্ষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভৃতিভূক একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তির অপর একজন শিক্ষিত এবং বয়স হিসাবে দৌহিত্রের সমবয়স্ক যুবকের তরুণ জীবনকে ফাঁসীর দড়িতে তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া অকালে প্রস্থিত করার জন্য প্রাণপণ

বাকচাতুর্য্যের ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিষয়ান্তরে মনঃ সংযোগপূর্ব্বক একটি বহু চিন্তিত অতীত কথা ভাবিতে-ছিল।

বিরামবাগের ভূতপূর্ব্ব জমিদার শশধর চক্রবর্ত্তী তাঁর পুরাতন ও অতি বিশ্বস্ত দেওয়ান বরুণ রায়ের দ্বারা ক্রুর ষড়যন্ত্রের ফলে যেদিন তাঁর সমস্ত জমিদারী সূর্য্যাস্ত নীলামের ফলে হারিয়ে পথের ফকির হইয়াছিলেন, শতবর্ষ না হোক সেও প্রায় ষাট সত্তর বৎসর পুর্ব্বেকার কথা। কি উপায়ে কেমন করিয়া তাহার চিরআবর্ত্তিত চক্র ঘুরিয়া গেল, মনিবের বিষয় হাত ঘুরিয়া ভৃত্যের হইল, সে সব কথার সঠিক খবর মেলে না। অনেকে অনেক রকমই বলিয়া থাকে, আর এরকম কাণ্ড এই একটি অথবা প্রথম নয়। যতদিন সূর্য্যাস্ত খাজনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, বহুবারই এ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে, লোভকে উবুদ্ধ করিবার যে সমস্ত সহজ পথ আছে এইটি তাদের অন্যতম।

শশধর অত্যুচ্চ অবস্থা হইতে একেবারে গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া নিজের দেশে আর বাস করেন নাই, ছোট বড় দেনার দায়ে মেয়েদের গায়ের অলঙ্কারপত্র ও জমিদার-প্রাসাদ সমস্তই বিক্রি করিয়া অঋণী হইলেও তিনি অপ্রবাসী হইবার আগ্রহ না রাখিয়াই পত্নী-পুত্র কন্যাদের লইয়া দেশত্যাগ করিলেন। তারপরের অনেক কথাই অস্পষ্ট,—শুধু স্পষ্ট করিয়া বন্দী খুনী আসামীর মনে পড়িল, তার শৈশবের সুখময় শান্তিময় চিত্রগুলি। সূর্য্য কিরণ সমুজ্জল হইয়া আজও সেগুলি যে তার মনের খাতার পাতায় পাতায় সাজানো রহিয়াছে।

বালি উত্তরপাড়ার একটি প্রান্তে একটি দোতলা ছোট্ট বাড়ীতে মা বাবা ও একটি মাত্র বড় বোনের সঙ্গে সে বাস করিত। দিদি তার চাইতে মাত্র দুটি বৎসরের বড়, তথাপি জ্যেষ্ঠত্বের গরিমায় সে তাকে ধীর গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই স্নেহ-শাসনে ছোট ভাইটির পূর্ণ অধিকার দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দিদি তার

একান্তরূপে দিদিই ছিল। একত্র শয়ন, ভোজন, পঠন, ক্রীড়ন, কেহ কাহাকেও যেন চোখের আড়াল করিতে প্রস্তুত নয়। তার বাবা দিনকর চক্রবর্ত্তী ঠিক উচ্চ শিক্ষিত আজকের কালে যাহাকে বলে তাহা হয়ত ছিলেন না যেহেতু আই. এ. পাশ কিম্বা ফেল, অথবা তাও নয়, এই রকম কিছু ছিলেন সেকথা সে ঠিক জানে না। সামান্য একটি সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরি চাকুরী করিয়া কোনমতে সংসার প্রতিপালন করিতেন। মা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী, গুণও ছিল তাঁর অসাধারণ। অভাবগ্রস্ত ক্ষুদ্র সংসারে তাঁকে লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হইত। অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া ঘর কন্নার যাবতীয় কর্ম্মকার্য্য সমাধা কবিতেন, যথা নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে অফিসের অন্ন, এই অবস্থার পক্ষে যতদিন সুস্বাদু এবং সুপরিচ্ছন্ন করিতে পারা যায়, তেমন করিয়া রাঁধিয়া বাড়িয়া স্বামীব কাছে হাসি-মুখে বসিয়া খাওয়াইতেন, ছেলেমেয়ের প্রতিও কোনদিনই কোন কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিয়াছেন বলিয়া তাঁর মনে পড়ে না। ঘর সংসাবের কর্ত্তব্য সমাধা কবিয়াও তাঁর কখনও সময়াভাব ঘটিত না। দুপুর বেলা ও সন্ধ্যার পর রান্নাঘরে কাজ কর্ম্মের মধ্যেই তাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মায়ের পড়াশুনা নিতান্ত অল্প ছিল না, মার কাছে শিখিয়াই তাবা দুই ভাইবোনে এক সঙ্গে একই ক্লাশে একেবারে ম্যাট্রিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। অঙ্কে আটকা না পড়িলে আরও কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে পড়ান চলিত। শুধু তাই নয়, পশমের জামা সোয়েটার মা যে অত কেন বুনিতেন, অনেক পরেই সে জানিয়াছিল, সেগুলি একজন সহৃদয়া প্রতিবেশিনীর সাহায্যে তিনি বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু আয় বাড়াতেন। একটি সেলাই-এর পুরাতন কল ছিল, মধ্যে মধ্যে তারই সাহায্যে তিনি ফ্রক ব্লাউজ সেলাই করিয়াও দু'পয়সা আমদানী করিতেন। এমন নিরলস অথচ শান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীচরিত্র সংসারে অল্পই দেখা যায়। এই রকমই ছিলেন তার মা। ভাগ্যে তার মা আজ বাঁচিয়া নাই। জ্ঞানের উদয় হওয়া পর্য্যন্ত সন্তান

ছুটিকে নীতি শিক্ষা দেওয়া, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে শেখান তাঁর প্রধানত কার্য্য ছিল। লোকের কাছে হাত পাতা দূরের কথা বাপের কাছে আবদার করিয়া কোন জিনিস আদায় করিতে পারা যায় এ বিশ্বাস তাদের জন্মিতে পারে নাই। শুধু একটি দিন দিদি স্কুলের মেয়েদের দেখিয়া আসিয়া বাপের সাক্ষাতে মাকে বলিয়াছিল, "ঐ রকম একটি সাড়ী পরতে ইচ্ছা করে।" মনে পড়ে বাপের মুখখানা কি এক রকম হইয়া গিয়াছিল, আর মা দিদিকে কাছে টানিয়া অতি শান্ত অথচ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ছিঃ মা, পরের দেখে ঐ রকম করতে নেই।"

এরপর দিদির মুখে পরদ্রব্যের প্রশংসা পর্য্যন্ত কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দিদিও তার সুন্দরী কম ছিল না। প্রায় বিনা পনেই তার বিবাহ হইয়া গেল। বর একটু বয়স্ক, ভাল চাকুরী করে, রাওলপিণ্ডিতে থাকে। বিবাহের পর বৎসর মাত্র পনের বৎসর বয়সে তার দিদি সলিলা তার ঘর করিতে চলিয়া গেল। চিঠি-পত্র আদান প্রদান বরাবরই আছে, ভাই ফোঁটায় ভাইয়ের জন্য উপঢৌকন প্রতি বৎসরই আসে, বিজয়াদশমীর আশীর্ব্বাদেও ভুল হয় না। দেখা এই দীর্ঘ দিনে মাত্র একটি বারের জন্য ঘটিয়াছিল। কাশীবাসিনী শাশুড়ীর মৃত্যুশয্যায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই আসিয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভাইয়ের সঙ্গে এবং শ্রাদ্ধ শেষ হইলে ফেরার মুখে মাকে সে তার ছেলেমেয়েদের দেখাইতে এবং দেখিতে আসিয়াছিল। সুখে ও সৌভাগ্যে দিদিকে আরও সুন্দর দেখিতে হইয়াছে। ওর ছেলে মেয়েরাও খুব সুশ্রী হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর পোশাকের অলঙ্কারে সুভূষিত হইয়া আসিয়াছিল। ওদের কোলে করিয়া মার দু'চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল সরিতে লাগিল। খুবই সেটা স্বাভাবিক, বাবাকে মেয়ের সৌভাগ্যযোগ দেখাইয়া একটু আনন্দ দান করিতে পারিলাম না। গভীর সুখের মধ্যেও এই অসীম দুঃখ আমাদের মনে শেলবিদ্ধ করিয়াছিল। আমার আই. এস-সি. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর আমাকে

প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াই তিনি সামান্য কয়েক দিনের মাত্র অসুখে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। স্কলারসিপের মাত্র পঁচিশ টাকা আয়, কলেজের মাহিনা যোগনই দুর্ঘট।

দিদি বলিল, "তপু, টিউসনি করে কি ভাল পড়া হয় রে? আমি তোর জামাইবাবুকে বলে তোর জন্যে টাকা পাঠাব। কত হলে তোর চলবে বল তো?" মাত্র দুটি বছরের বড়দিদি তার গৃহিণীপনায় তার সে কি হাসিই যে পাইয়াছিল! প্রথমে হাসি তামাসায় কাটাইয়া শেষকালে দিদির বড় বেশী জিদ দেখিয়া আসল কথাটা তাকে ভাঙ্গিতেই হইল, বলিল, "না দিদি, তা করো না, তিনি দিলে, আমি নোব না। মানুষের প্রথম থেকে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করা উচিত। পরের ঘাড়ে ভর দিতে অভ্যস্ত হলে নিজের উপর নির্ভর করার জোর মনে থাকে না।"

দিদি রাগিয়া বলিল, "আমরা তোর পর? দেখ মা তোমার আদুরে ছেলে কি বলছে!"

মা এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া জামাইয়ের জন্য কলাপাতার সাহায্যে নিজের হাতে পাক করা চন্দ্রপুলি গড়িতেছিলেন, শান্ত উদাসীনতার সহিত উত্তর দিলেন, "ভাল কথাই তো বলেছে। নিজের ভার পরের উপর ফেলা কি ভাল?"

দিদির বোধ করি সেই ঢাকাই শাড়ী পরিবার ক্ষণিক ইচ্ছা প্রকাশের পরিণামটা মনে পড়িয়াছিল, অপ্রতিভ হইয়াছে বুঝা গেল। তথাপি মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু মা, তোমার জামাই এখন হাজার টাকা করে মাইনে পাচ্ছেন, আর ও এতটা কষ্ট করবে? আমি তাতে শান্তি পাবো?"

মা কহিলেন, "এই মনে করে মনকে শান্ত করে তোমার ভাই বিরামবাগের স্বনামধন্য জমিদার শশধর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। তাঁরা বরাবর হাত উপুড় করে এসেছেন, চিৎ কখনও করেননি। ওর শরীরে সেই রক্তই তো বইছে।"

নিজেদের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় বাবার মৃত্যুর পর সে মার

মুখে শুনেছিল ; সম্প্রতি সলিলাও সে কথা শুনিয়াছে। সে দুঃখিত ও কুণ্ঠিতভাবে নীরব হইল, কিন্তু মন হইতে হয়ত দুঃখটা সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। ইহার পর তার স্বামী তাহাকে ডাকিয়া খুব স্নেহের সহিত এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, "তোমার আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান দেখে খুব খুশী হয়েছি তপন। আমি বলছি তুমি উঠবে, নিশ্চয় উঠবে।"

তার পরস্পর সংবদ্ধ ওষ্ঠাধারের একটি পাশে এক ফোঁটা হাস্যাভাস মুহূর্ত্তের জন্য উচ্চকিত হইয়াই স্থির প্রশান্ত মুখভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মিলাইয়া গেল। তিনি যখন জানিবেন—দুবেলা দুঘণ্টা টিউশনি, বাড়ী হইতে যাতায়াত করিয়া পড়া, তা সত্ত্বেও সে বি. এস-সি.-তে সর্ব্বপ্রথম হইয়া মেডেল ও স্কলারশিপ লাভ করিল। এরপর তাকে এম. এস-সি. পড়িতে ও ল' কলেজে যোগদান করিতে দেখিয়া তার জীবনের সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী জননী দেবী অনন্ত ধামে যাত্রা করিলেন। পিতৃহারা হইয়া সে শোকাকুল হইয়াছিল, মাকে হারাইয়া বজ্রাহত হইল।

সলিলা অতদূর হইতে সঙ্গীর অভাবে আসিতে পারিল না। তার জামাইবাবু বহু সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়া সেই সঙ্গে মাতৃ শ্রাদ্ধের লৌকিকতার নামে দুই শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। মাতৃকৃত্যের পর দিদির বিবাহকালে বন্ধক দেওয়া বাড়ী সুদের বিপুলতায় সে মহাজনকে ধরিয়া দিয়া কলিকাতার মেসের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। দিদিকে এসব কথা কিছুই জানিতে দিল না।

এম. এস-সি. পরীক্ষার ফল খুব ভাল হয় নাই, কিন্তু প্রথম বিভাগেই সে স্থান লাভ করিয়াছিল। এক বছর মাত্র আইনের শেষ পরীক্ষা বাকি, এমন সময় সে তার ল' কলেজের বন্ধু অরুণ রায়ের অনুরোধে তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় গৃহে একটু মোটা মাহিনার প্রাইভেট টিউটার হইয়া প্রবেশ লাভ করিল।

অরুণের সঙ্গে যদি তার পরিচয় না হইত! বিজ্ঞানের ছাত্র সে, অনর্থক কিসের খেয়ালে কোন দুষ্ট গ্রহের দুস্থ-আকর্ষণে আইন পড়িবার মত দুর্বুদ্ধিগ্রস্ত

হইয়াছিল, ভগবানই জানেন। মা থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাকে এমন খামখেয়ালিপণা করিতে দিতেন না।

অরুণ সত্য করিয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তার দর্পহীন দাম্ভীকতা শূন্য নির্ম্মল তেজস্বিতা ও ততোধিক নির্ম্মলতর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে, এই কথা সে বারম্বার করিয়াই বলিয়াছে। নানা ছলে নানা অছিলায় তাহাকে সহায়তা করিতে গিয়া পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সে সেকার্য্যে নিবৃত্ত হইতে পারে নাই, অবশেষে তার পিসেমশাই-এর বাড়ীতে এই পঁচাত্তর টাকা বেতনের মাস্টারীটা যোগাড় করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া সে বাঁচিল। সকালে ল' কলেজ, দুপুরে য়ুনিভারসিটি ঘুরিয়া দু-দুটো কম টাকার টিউশনি করিতে করিতে তখন সে শুষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে, সে কথা অরুণ না বলিলেও নিজে সে জানিত, গ্রাহ্য করিবার অবসর বা সুযোগ ছিল না।

কিন্তু অরুণের এই ভালবাসা তার পক্ষে রাহুর প্রেমের মতই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। তার জীবনকে সে পূর্ণগ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিছুদিন খুবই শান্তিতে কাটিয়াছে, দিদি চলিয়া যাইবার পর এ পর্য্যন্ত যে জীবন তার কাটিয়াছিল, তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। বিকালে সে অরুণের পিস্তুতো দুই ভাইকে পড়াইতে যাইত, ঘণ্টা দুই পড়াইবার কথা, সময়ের হিসাব না রাখিয়া সে প্রয়োজন মত কোন কোন দিন তিন ঘণ্টারও বেশী তাদের সঙ্গে খাটিয়া চলিয়াছে। বাড়ীর ভিতর হইতে চা, জলখাবার আসিত, মধ্যে মধ্যে রাত্রে খাওয়ারও নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন পরেই বাড়ীর মেয়েরাও তার সাক্ষাতে বাহির হইতে, কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। সে যেন তাঁদের ঘরের লোক হইয়া গেল। বাড়ীর ছোট বড় ছেলেমেয়ে ছাড়া সে বাড়ীতে ছিল একজন তরুণী। সেই বি. এ. ক্লাসের ছাত্রীটির নাম অজিতা। সে অরুণের পিসিমার ভাসুরঝি। কলেজে পড়ার জন্য কলিকাতায় তাঁর বাড়ীতে বাস করিতেছে। তাদের বাড়ী

মফঃস্বলের কোন শহরে, কোথায় সে কথা সে কোন দিন জানিতে চেষ্টাও করে নাই। এমন অনাবশ্যক বিষয়ের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি তার মধ্যে ছিল না। দেখিতে দেখিতে অজিতাও অরুণের সহযোগে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সায়েন্সের ছাত্র হইলেও সে ইংরাজী, বাংলা সাহিত্য খুব ভাল করিয়াই পড়িয়াছিল। বি. এ.-তে সে ইংরাজীতে অনার্স পাইয়াছে। অরুণকে দিয়া প্রস্তাব করিল, তপন যদি এক ঘণ্টা পড়ান এবং পঞ্চাশটা করিয়া টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ গ্রহণ করেন তবে তার পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। অন্য মাস্টার রাখার তার ইচ্ছা নাই। সে অরুণকে এবং পরিশেষে অজিতাকেও বলিয়াছিল, তার সময় যথেষ্ট থাকে, ছেলেরা ক'চিছেলে নয়, একত্রে পড়ান খুবই চলে এবং এক আধ ঘণ্টা অজিতার জন্য খরচ করিলে সে মারা পড়িবে না। অরুণ নির্ব্বন্ধ সহকারে তাহাকে পড়ানোর পারিশ্রমিক লওয়ার জন্য অনুরোধ করিল। কিছুতেই সম্মত করিতে না পারিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল তোমার যেন মোষের গোঁ, না বললে আর হ্যাঁ হবে না। সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল ; নেহাত মোষকা না বলে হাতিকা দাঁত বলতে পার। অরুণ তার পিঠে সজোরে একটা চড় মারিয়া সবেগে বলিয়াছিল, "এই একরোকমীতে তোমায় হয় আকাশে তুলবে না হয় পাতালে ফেলে দেবে। এতটা জিদ ভাল নয়।"

"সেটা অতিদর্প, দুর্য্যোধন রাবণ তারা অতিদর্পে হত হয়েছিল সে ঠিক কিন্তু আমার মত গরীব বেচারার কিসের দর্প থাকবে বলতো ? এ শুধু আত্মরক্ষার একটা মাত্র পথ। ভিক্ষান্ন বা করুণান্নে দেহ এত দিনে সুপুষ্ট হয়ে আত্মমর্য্যাদাটুকুকেও যে হজম করে ফেলতাম যাঁরা এত যত্ন করেছেন, মেয়েদের দিয়ে ভাই ফোঁটা দেওয়া কেন, মা হয়ে জন্মদিনের আশীর্ব্বাদী—আমার পক্ষ থেকে আমি থাকবো সর্ব্ববিষয়েই তাদের বেতনভুক ভৃত্য রূপে ? আত্মীয়তা অস্বীকার করে ?" অরুণ হয়ত তার মনোভাবটা ঠিকই অনুভব করিয়াছিল, কিন্তু অজিতা তখনও সম্পূর্ণরূপে

বোঝে নাই। মুখখানি একান্ত ম্লান করিয়া সে নিঃশব্দ পদে ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইল, সে তার আগমন কি জানি কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল, হাসিমুখেই ডাকিয়াছিল, "আসুন, সেক্সপিয়ারের দিন ছিল না আজ?" অজিতা শান্ত অথচ ঈষদ্দৃঢ় কণ্ঠে বলে সে আর থেকে থাকলে কি হবে, আপনি তো আমায় পড়াবেন না বলেই দিয়েছেন।"

"বলে দিয়েছি? ওটা তো ভারি মিথ্যুক। বলেছি আমি আপনার ভৃত্য হতে পারবো না, গুরু হবো; এটা কি এতই অন্যায় দাবী?"

একথায় অজিতার সেই সাদা গোলাপের মত শুভ্র মুখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল, সে এক মুহূর্ত্তের জন্য নতদৃষ্টি তুলিতেই তার ঘন কালো তারার ভিতর কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব সূক্ষ্মবস্তুকে সে সেই মুহূর্ত্তে অতি স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিতে পাইয়াছিল। একটুক্ষণ পরেই সে যখন কথা কহিল, তার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট রূপেই কম্পিত হইতেছিল, বেশ বোঝা গেল, সে কহিল, সুস্পষ্টস্বরে বলিবার চেষ্টা করিয়াই বলিল, "যদি গুরুদক্ষিণা নিতে এর পরেও জোর আপত্তি না দেখান, তাহলে আপনার দয়ার দান নিয়ে আপনার শিষ্য হতে আমার আপত্তি নেই।" "গুরুদক্ষিণা নিতে ওজর আপত্তি, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে! বলছেন কি আপনি?"—"কেন অরুণদাকে একথা বলেননি, আপনাদের বংশে হাত উপুড় করতেই জানে, চিৎ করতে কেউ নাকি শেখায়নি!" "ওঃ ওই কথা বলেছি নাকি? তা হবে, তবে সে হয়ত খুব বেশী দূর অতীতের কথা নয়, আমি এখন সেই প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণদের কথাই ভাবছি,—সেই আরুণি, উদ্দালক, উতথ্য······আরও সব অনেকেই ছিলেন, তারা বেশ ভাল করেই মোটা মোটা গুরুদক্ষিণা আদায় করেছেন।"

এবার অজিতার গাম্ভীর্য্যেও রহস্যে বিমিশ্রিত মুখকান্তি হাস্যাভাষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শরতের মেঘের উপর রৌদ্রকিরণ যেন চকিত হইয়া উঠিল, সে

বলিল, "হ্যাঁ গরু চড়িয়ে,—আল বাঁধিয়ে, উপোস করিয়ে,—সেক্সপিয়ার মিল্টন পড়িয়ে নেয়! তা আপনিও আজ থেকে আপনার রাঁধুনী ছাড়িয়ে দিন—চাকরটাকে দিয়ে দিন জবাব।"

সে সম্পূর্ণ ঔদাস্যের ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়া বাধা দিয়াছিল,—"আহা সে জন্যে ব্যস্ত হবেন না, সে সব কাজ আমার সারাই আছে। আজ বরঞ্চ একটু পড়ে নিন। এ বিদ্যা যদিও ব্রহ্ম বিদ্যা নয়, তথাপি রাজ বিদ্যা তো বটে, হয় তো তার বিনিময়ে জর্জ সিক্সথের মহিষীর শ্রবণ কুণ্ডলই বা আপনাকে অদূর ভবিষ্যতে ফরমায়েসই বা দিয়ে বসি, আচ্ছা সে তখন দেখা যাবে, ভেবে চিন্তে। এখন আসুন তো।"

অজিতা মুচকি হাসিয়া, "শ্রবণ কুণ্ডল পরাইবে কার শ্রবণ যুগল আগে—" তারপর আর শোনা গেলনা, সে কি যেন বলিল, ও তখনি দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তেই সে বুঝিয়াছিল, তার সমস্ত পৃথিবীর সৌরকান্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বিস্বাদ বিরস জীবন অকস্মাৎ দক্ষিণ হাওয়ায় সরসসুমধুর হইয়া উঠিয়াছে।

অরুণ ও তপন দু'জনকারই আইনের শেষ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। একদিন তার মেসের বাসায় আসিয়া অরুণ বলিল, "কালই বিরামবাগ যাচ্ছি, তুমিও চলো না বেশ একটু চেঞ্জ হবে। একঘেয়ে কলকাত্তিয়া হয়ে গেছ, চলো একটু গ্রাম্যজীবন উপভোগ করবে চলো।"

"বিরামবাগ! সেখানে কি?" "বাঃ তুমি জানো না নাকি? বিরামবাগেই তো আমার বাড়ী।" ঈষৎ অশস্তি বোধ করিতে করিতে সে বলিয়া বসিল, "কই তুমি তো কখন বলোনি।"—"বলিনি? তা হবে হয় তো। তুমিও তো কই কখন জানতেও চাওনি। আশ্চর্য্য হচ্ছো যে, তুমি কি বিরামবাগ চেন?" তার অশান্তি বোধটা বাড়িতে লাগিল, একটু ইতঃস্তত করিয়া চাহিল, "আমি, না, হ্যাঁ

নাম শুনেছি,—দেখিনি কখনও।"

"নাম শুনেছ? আশ্চর্য্য! বিরামবাগে তো তাজমহল নেই. তাজমহল হোটেলও নেই, শোনবার উপলক্ষ্যটা কি? সামান্য একটা গ্রাম বললেই হয়, থাকার মধ্যে দেড়শো খানেক বৎসরের পুরনো জমিদার বাড়ী এইটুকুই যা আমাদের গর্ব্ব। অবিশ্যি সম্প্রতি আমরা ডায়নামো বসিয়ে লাইট ও টিউবওয়েল ট্যাঙ্ক দিয়ে জলের কলের ব্যবস্থা করে তাকে নিউ ক্যালকাট্টা বানিয়ে ফেলতে কশুর করিনি।"

—"তুমি—তুমি তোমার—কে বরুণ রায়? কে, কে হতো?"

বিস্মিত অরুণ গভীর উত্তেজনায় প্রায় রুদ্ধশ্বাস তপনের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিল, হঠাৎ তার হইল কি? বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করিল, "ঠাকুরদাদা, কেন?"

"কেন? জিজ্ঞেস করছো কেন? কেন তুমি আমায় তোমার পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে অরুণ? কেন তুমি আমায় জানতে দাওনি যে, তুমি বিশ্বাসঘাতক প্রভু-প্রাণহন্তা বরুণ রায়ের বংশধর। উঃ যার জন্যে আমার দেবতুল্য পিতামহ সর্ব্বহারা হয়ে লজ্জায় ঘৃণায় দেশত্যাগী দরিদ্র ভিক্ষুকরূপে অকালে প্রাণ দিয়েছেন, আমার বাপ অসময়ে লেখাপড়া শেষ করতে বাধ্য হয়ে দৈন্য নিপীড়িত জীবন দুর্ব্বহরূপেই বহন করে গেছেন, তুমি সেই পিতামহের পৌত্র, তারই রক্ত তোমার শরীরে বইছে, আর আমি তোমাদেরই অন্নদাস? ধিক্ আমার বেঁচে থাকায়!"

"তপন এসব কি তুমি বলছো? আমি জানি আমার ঠাকুরদা তার পূর্ব্ব প্রভুর সম্পত্তি তাঁর পতনের পর কিনে নিয়েছেন, সেটা কি খুবই একটা অপরাধ? তিনি না নিলে আর একজন নিতই।"

সে বলিয়াছিল, "অপরাধের মাত্রাজ্ঞান তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ আশা করবো না। খাজনার টাকা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যে কর্ম্মচারী ষড়যন্ত্র করে অন্যকে দিয়ে টাকা লুট হয়েছে বলে সেই টাকাতেই নিজের শালার নামে জমিদারী জলের

করে নীলেমে ডেকে নেয় এবং পরে মহাজনদের উস্কে দিয়ে ঋণের দায়ে বাকী সর্ব্বস্ব, মায় বসত বাড়ী সুদ্ধ নিজে কিনে নিয়ে প্রভুর সিংহাসনের রাজা হয়ে বসে তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু বলবার মতন ভাষা আমার অভিধানে লেখা নেই। যাক অতি বিশ্বাস করে পরের হাতের তলায় গলা বাড়িয়ে দিলে ঐরকমই হয় তবে দয়া করে ওঁদের বলে দিও আমি আর ওখানে পড়াতে যাবো না।"

অরুণের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তেজিত ভাবে সে অনেক কিছুই বলিয়াছিল, কি কি কথা সে সব মনে রাখিবার মতও নয় এবং সে সব যুক্তির সারবত্তা কিছুই নাই, যাহা লইয়া তর্ক করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। নিজ পক্ষের দোষস্খালনের জন্য মামুলী ভাবে অপমাণিত ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যে রকম সব কথা বলে তাই। পবিশেষে অরুণ বলিল, "তিন পুরুষ বাদে বর্ব্বর জাতির মত প্রতিহিংসার হিংস্রতা পুষে বেড়াচ্ছো, তুমি না শিক্ষিত লোক?"

মনে আছে এই কথা বলিয়া সে জবাব দিয়াছিল, "পিতৃ-পিতামহদের নির্য্যাতন-কারীর বুকের রক্ত দিয়ে তাঁদের তর্পন করে যারা আমি বলবো, সত্যকার শিক্ষা তারাই পেয়েছে। পিতৃশত্রুর বংশের লোকদের পা চেটে বেঁচে থাকে যে, নিজেকে শিক্ষিত বলবার কোন অধিকারই তার নেই।"

রাগে রাঙ্গা হইয়া অরুণ তার দুহাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিল, "তোমাকে আমি ঐ কথা ফিরিয়ে বলতে পারতুম যদি হাতে আমার একটা রিভলবার থাকতো!" তার গলা চাপিয়া স্বর বাধিয়া গেল। তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের মত তীব্র হাসিয়া এও বলিয়াছিল, "ঠিক ঐ কথাটাই একসঙ্গে আমারও মনে হচ্ছে। চলে যাও অরুণ রায়। এরপর আর আমাদের যেন কখন মুখ দেখাদেখি না হয়।" দ্বারের বাহিরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর যে ক' জনকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহারা সাক্ষী দিয়াছে—বলিয়াছে, তপন 'শোনিত তর্পনের কথা' বলিয়াছিল, তার শেষ কথাটাও তারা বলিতে ইতস্ততঃ করে নাই। এ যে ধর্ম্মের পীঠস্থান, বরং একটু বেশী বলা

চলে তো কম করা চলে না! অবশ্য তপনকে মেসের সকলেই ভাল বাসিত কিন্তু সরকার পক্ষের এবং বিপক্ষ পক্ষের কৌসুলীদের জেরার কাছে কার রক্ষা আছে! অরুণ এই কয়দিনে কি হইয়া গিয়াছে! সে একবারও তার দিকে চাহিয়া দেখে নাই। নিরপেক্ষভাবে সমস্ত কথাই বলিয়া যেমন আসিয়াছিল, তেমনই সোজা সামনে চাহিয়াই চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে,—জেরায় বলিয়াছে, তপন তার পিতৃহন্তা কিনা সে বিষয়ে সে নিঃসন্দিগ্ধ নয়। তবে মামুলী সর্ব্ব-ভারতীয় একটা ডাকাতের দলের সঙ্গে তপনের মত ভদ্র উচ্চ শিক্ষিতের সংস্রব সে মনে করিতেও পারে না। তিন বৎসর সে তপনকে দেখিতেছে, অবশ্য এক বৎসর ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছিল। তাই এ জিনিসটা তার কাছে একান্তরূপে রহস্যের মতই বোধ হইয়াছে। মনে হয় অরুণ তাহাকে ফাঁসিতে লটকাইবার জন্য খুব বেশী ব্যস্ত নয়। আশ্চর্য্য! অথচ বরুণ রায়ের পৌত্র সে।

তার মনে পড়িল অরুণের সঙ্গে বিবাদ ঘটার পর এবং তার পরদিন অজিতার নিকট হইতে দুইখানা পত্রে তাকে তার সঙ্গে একবার দেখা করবার জন্য অনুরোধ এমন কি অনুনয় জানানো হইয়াছিল, সে যায় নাই। তৃতীয় দিনে সে গভীর কৌতূহলে গোপনে বিরামবাগের জমিদার বাড়ীটা বারেকের মত আড়াল হইতে দেখিয়া আসিবার জন্য কি জানি কাহার দ্বারা আকর্ষিত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছিল।

আবার কাহার? নিয়তির! সেখানে অরুণের চাকরের সঙ্গে সেই বাড়ীর পিছন দিকের রাস্তায় সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘুরিবার সময় হঠাৎ দেখা হয়। চিনিতে পারিয়া নবীন আহ্লাদে চেঁচাইয়া ওঠে, "মাষ্টারবাবু না? আইসেন, আইসেন, এন্দাকে? কুথায় ঘাপটি মাইরা ঘুরছেন, বাড়ী থেক আইসেন।"

কত কষ্টেই যে তার হাত ছাড়াইয়াছিল, কারুকে না বলিবার জন্য দুটাকা, তার অবিশিষ্ট সম্বলের আটটাকার মধ্যে দুটাকা ঘুষ খাওয়াইয়াছিল, তখন কি স্বপ্নেও জানিত নিজেরই ফাঁসির দড়িতে সে স্বহস্তে আর একটা লাগাইতেছে।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে, মেসের বাড়ীর নিরাড়ম্বর রান্না খাওয়া সমাপ্ত, নিজের ঘরের বিছানায় পড়িয়া সে কত কি ভাবিতেছিল, অরুণের প্রতি নিজের ব্যবহারটা সঙ্গত হইয়াছে না অসঙ্গত এই ভাবনাটাই তার মধ্যে প্রধান। এমন সময় ভেজানো দরজা খুলিয়া কেহ গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো ছিল না, হ্যারিকেন লণ্ঠন নিবাইয়া দিয়াছিল, পড়াশোনার ইচ্ছা ছিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

যে আসিয়াছিল, আন্দাজে অগ্রসর হইয়া টর্চ্চ জ্বালিল, অতি বিস্ময়ে তপন বিছানায় উঠিয়া সাশ্চর্য্যে উচ্চারণ করিল, "অজিতা।"

উত্তর হইল, "চুপ!" তারপরই বলিল, "পাঁগড়ী বেঁধে অলষ্টার পরে ভুরু মোটা করে এঁকে এলুম, তবু চিনতে পারলেন।"

অজিত শুধু ঈষৎ হাসিল, এই চিনিবার রহস্য এই কয় দিনেই তার কাছেই উদ্ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যথাসাধ্য আবেগ দমন পূর্ব্বক কহিল, "এর মানে?"

"মানে অতি সোজা। ডাকাডাকি করে সাড়া পেলুম না, তাই বাড়ী বয়ে গুরুদক্ষিণাটা দিতে এসেছি, আপনি তো আর আমাকে পড়াতে রাজী নন।"

অর্দ্ধ অভিভূত ভাবেই সে উত্তর দিয়াছিল, "না।" অজিতা বলিয়াছিল, "বেশ নাই পড়ালেন, কিন্তু এই একবৎসরের গুরু-দক্ষিণা শোধ করে নিয়ে জন্মের মত আমার ভার নিন, এই দক্ষিণা দিতেই আমি এসেছি। শুধু কুণ্ডলই নয়, কান এবং মাথাও।" তপন চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিয়াছিল, "কি বলছেন? ছি ছি, আপনি—"

অজিতা আরও কাছে আসিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমার দিক থেকে 'ছি-ছি'র কিছুই নেই তপনবাবু! আমি বরুণরায়ের কেউ হই না এবং কেউ হবো না বলেই আপনার শরণাগত হয়েছি ওঁদের বংশের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা আমি জানি। আমার মা ছিলেন শশধর চক্রবর্ত্তীর উকিল

মন্মথ ঘোষালের মেয়ে। ওঁদের কাছেই আমার কিছু কিছু জানা ছিল, তারপর অরুণদার কাছে বাকিটাও এবার জানলুম। আমার বাবা অরুণের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির করেছেন, প্রথম ফাল্গুনেই বিয়ে হ'বার দিনও স্থির হয়ে গ্যাছে, মাঝে দিন পনের মাত্র সময় বাকি। আমি ওকে বিয়ে করবো না, কিছুতেই করবো না, অথচ আমার বাবা কিছুতেই আমার আপত্তি শুনতে রাজী ন'ন।"

তপনের প্রথম বিস্ময়ের ঘোর না কাটিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, সে অজিতার মুখের উপর বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তেমনই প্রশ্ন করিল, "তা আমি তার কি করতে পারি?"

অজিতা ঈষৎ রাগতভাবে টর্চ্চের আলোটা তার মুখের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিয়া দারুণ অসহিষ্ণুতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর করিল, "এরপরেও আবার পুরুষমানুষকে আরও স্পষ্ট করে বলে দিতে হয় যে, আমি আপনাকে স্বামীরূপে পেতে চাই। যদি আপনি আমায় বিয়ে না করেন; এই এমনি করে মরবো—কেউ আমায় ধরে রাখতে পারবে না।"

"অজিতা! না না, এ হতে পারে না।" "বেশ, নাই হলো, এই দেখুন কাকাবাবুর পিস্তল চুরি করেছি এবং তা ভরাই আছে। ভয় নেই, আপনাকে বিপদে ফেলবো না। মরতে হয়ত ওঁর বাড়িতে ফিরে গিয়েই মরবো।" এই বলিয়া অজিতা সত্যসত্যই তার গায়ে-পরা পুরুষের লম্বা ওভার কোটের পকেট হইতে ছোট্ট এবং সুদৃঢ় গঠনের একটা পিস্তল বাহির করিয়া দেখাইল।

সে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিল, সকাতরে ওর পিস্তলসুদ্ধ হাত ধরিয়া বলিল, "অস্ত্রটা যদি বিনাবাধায় আমার কাছে সমর্পন করো, আমি রাজী আছি। আমার গোপন চিত্তের নিস্কাম প্রেম যদি সত্যই তোমায় আকর্ষণ করে থাকে, আশাকরি তুমি আমায় আবিশ্বাস করবে না।" "না, "করবো না।" বলিয়া অজিতা পিস্তলটা তার হাতে দ্বিধাহীনচিত্তে ছাড়িয়া দিল।

অজিতা চলিয়া যাইবার পর তার পাশের ঘরের বাসিন্দা অমর আসিয়া সসব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এতরাত্রে একটা কাবলীওলা তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যে? ওর কাছে টাকা ধার করে মরেছ বুঝি? তবেই তোমার হয়েছে।"

তপনের নেশা খাওয়ার বিহ্বলতা তখনও ঠিক না কাটিলেও সে ওরই ভিতর ঈষৎ হাস্য করিয়া জবাব দিয়াছিল, "উঁহু, ও হিং বেচতে এসেছিল।"

অমর মুখ সিটকাইয়া মন্তব্য করিল, "বাজে কথা।" সেই কাবুলী কাহিনী তার বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রমাণ এবং তার চেয়েও সাংঘাতিক প্রমাণ রায়সাহেবের বাড়ীর হারানো পিস্তল তার গৃহ শিক্ষকের ঘরে পাওয়া। এরও পরে ফাঁসি কাঠের কথা না ভাবিয়া মানুষে নিশ্চিন্তভাবে মরা-মায়ের কথা ও তাঁর কাছে শেখা ভগবানের ন্যায় বিচারের কথা ভাবে কি রূপে? সে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, ফাঁসির দড়ির ভাবনা তার মনে তিলার্দ্ধও স্থান পায় নাই। অথচ জজের কাল টুপি চড়িবার আর কতটুকুই বা দেরী? জুরীরা এইবার উঠি উঠি করিতেছে সেও বেশ বোঝা যায়।

আসামীপক্ষের উকিল প্রথম হইতেই একরকম হালছাড়া ভাবেই আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টায় তার কোনই জোর ছিল না। ফলাফল তার তো সুস্পষ্টরূপে জানাই ছিল। হঠাৎ যেন কে কি বলিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে কিছু উৎসাহিত ভাবে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন, ও কি যে চমকে বলিলেন, কি উত্তর প্রত্যুত্তর হইল, তপন সে সব কথায় কান দেয় নাই, অজিতার মাসিমার বাড়ী শিবচতুর্দ্দশীর পূর্ব্ব রাত্রে মাঘ মাসের শীতে তার হাতের উপর অজিতার হাতের তপ্ত স্পর্শের এবং গভীর দায়িত্বে সংশয় আশঙ্কায় সম্মিলিত তার অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের স্মৃতিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই তিনি রাত্রি মেসের বাসায় সত্যই সে উপস্থিত ছিল না, এ সাক্ষ্য যাহারা দিয়াছে তারা ঠিক কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কেন ছিল না,

সে কথা বলিবার জন্য তো কেহই এ পর্য্যন্ত দেখাও দেয় নাই। সেকথা সে নিজেও তো বলিতে পারিত? কেন বলে নাই? বলিতে অজিতার যে নিষেধ ছিল। সে নিজেই জানাইবে, এই কথাই সে তাহাকে জোরের সঙ্গেই বলিয়া দিয়াছিল। তাই না সে তার রহস্যময় নিরুদ্দিষ্টতার কাহিনী এই আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের পুর্ব্বক্ষণেও অপ্রকাশ্য রাখিয়াছে। হিন্দুর মেয়ে অজিতা কি তার স্বেচ্ছাবিবাহের নির্ব্বাচিত পতিকে সব জানিয়া শুনিয়াও মরনের মুখে ঠেলিয়া দিবে? এও কি কখন সম্ভব?—

সহসা সে শুনিতে পাইল,—সরকারী উকিল তাঁর শেষ বক্তৃতায় প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দূর্দ্দল হিংস্র পশুতুল্য নরঘাতকের শেষ বর্ণনাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই অধৈর্য্যে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "জিতা! জিতা! জিতা! একি! একি এখানে তুমি? তুমি? এবেশে? এখানে?"

সাক্ষ্যমঞ্চের দিকে আসামীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। টক্‌টকে সিঁদুর মাথায়, চওড়া লাল পাড় শাড়ী-পরা অজিতা এবং সঙ্গে তাদের বিবাহরাত্রের সহায়তাকারীর একটি বেশ বড় দল, যথা অজিতার মাসিমা, তাঁর পুত্র নরেন, অজিতার সহপাঠিনী অতসী ও তাদের বিবাহ প্রদাতা বৃদ্ধ পুরোহিত—এঁরা শ্রেণী-বদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া। অজিতা তার পিতাকে যুক্ত করে প্রণাম জানাইয়া জজের ও জুরীদের দিকে ফিরিয়া অকম্পিত স্বরে কহিতে লাগিল—

ধর্ম্মাবতার! আমি আপনাদের এই খুনী আসামীর যথাশাস্ত্রানুসারে বিবাহিতা স্ত্রী। শিব চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বরাত্রে আমার মাসিমা শ্রীমতী সুলোচনা দেবীর বাড়ীতে আমরা দু'জনে বিবাহিত হয়েছি। ঐ পিস্তল আমার কাকাবাবু রায়সাহেব ত্রিলোচন ঘোষালের শোবার ঘর থেকে আমিই চুরি করেছিলুম। ছদ্মবেশে মেসে গিয়ে ঐ নির্য্যাতীত ভদ্রলোককে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে, আমাকে অরুণ রায়কে বিয়ে করবার বিপদ থেকে রক্ষা করতে রাজী আমিই করেছি। পিস্তলটা

তিনি সেই সর্তে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। কাবুলী অবশ্য আমি সাজিনি, তবে মোটা পাগড়ী ও অলস্টার একটা পরেছিলুম। ওখানে যাবার আগে আমার মাসিমাকেও ঠিক এই উপায়েই আমাদের বিয়ে দিতে অনেক কষ্টে রাজী করি। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, আমার এই স্বার্থপর খেয়ালে আমার স্বামীকে এত বড় লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হবে! আমরা সতী সাবিত্রীর দেশের মেয়ে, যাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, তাঁকে ছাড়া অন্য পুরুষকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যে অসম্ভব। তাই আমার কন্যাবৎসল পিতার সম্মতি পাবো না জেনেই আমায় এই রকম লুকোচুরি ও জবরদস্তি করতে হয়েছে। এঁদের সাক্ষী আপনারা নিন, সেদিন মাসিমার বাড়ীর নিমন্ত্রিত আরও একশ জনের সাক্ষী নিয়েও দেখুন—ঐ দিন ও তার পরের দিন আসামী তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন কি ছিলেন না। আর বাবা! আপনি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। যা আমি করেছি তা আপনার ও মায়ের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত থেকেই তো পেয়ে করেছি। মা যে আমার সাবিত্রী ব্রত করতেন সে তো আপনি ভাল করেই জানেন! সে ব্রতয় নারায়ণের সঙ্গে সমান ভেবে স্বামী পূজো করতে হয়, আপনি চৌদ্দ বছর ধরে আমার মায়ের হাত থেকে সে পূজা নিয়েছেন, আমি তো সেই মায়েরই মেয়ে, যতই আধুনিকাই হই না কেন, ভিতরের রক্ত কোথায় যাবে?

সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই, সূর্য্য পাটে বসিয়াছেন। নীল আকাশের এক তৃতীয়াংশ জুড়িয়া তাঁর বিদায়-অভিনন্দনের আরক্ত স্বর্ণরাগে আতস বাজী এবং খাসগেলাসের আলোকমালায় সমুজ্জল হইয়া রহিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে আস্তে আস্তে কতকগুলি এইমাত্র নিভিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পৃথিবীর বুকেও দর্পণোদ্ভাসিত প্রতিবিম্বের মতই সেই উৎসবালোকের রক্তচ্ছটা এতক্ষণ তার সমস্ত দৃশ্যাবলীতে লাল আবির ও স্বর্ণরেণু মাখাইয়া রাখিয়াছিল সেও ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছে। নদীর জলে যদিও এখনও সেই রক্তধারা একেবারে বহিয়া চলিয়া যায় নাই, তীর তরুদের মাথাতেও সবুজের সঙ্গে সোনা মেশানো পাগড়ীগুলাও এখনও সেই একই রকম ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

দুজন পান্থ আসিয়া নদীর তীরে দাঁড়াইল। দেখিলে বুঝা যায়, দুজনেই সমান ক্লান্ত; অনেক দূরের পথ হয়ত এক সঙ্গেই দুজনে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। আকাশচারীদের উৎসবের আলোর অঞ্জলি অবশ্য তাদের উপর বর্ষিত হইতে কার্পণ্য করে নাই, তা সত্বেও তাদের মৌন ম্লান মুখে-চোখে একটা গভীর শ্রান্তির অবসাদ ঢাকা ছিল না।

সর্ব্বাঙ্গ তাদের ধূলি ধূসরিত। গায়ের পোশাকেও ধূলার চিহ্ন সুব্যক্ত। বয়স দুজনকার অনেকটা একই হওয়া সম্ভব, তবে ঠিক একই বয়সী হয়ত নয়, দুই হইতে বৎসর পাঁচেকের তফাৎ হওয়াও বিচিত্র নয়—যেহেতু এই দুইটি তরুণের জাগতিক বা সাংসারিক অবস্থার যে যথেষ্ট তারতম্য আছে, সে তাদের আপাদ-

মস্তকের সমস্তটাতেই পরিষ্কার রূপে জানা যাইতেছিল।

ছেলে দুটি আসিয়াই সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে নদীগর্ভে চাহিয়া দেখিল—বোধ করি খেয়া-নৌকারই খোঁজ করিল। এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে চাহিয়া চাহিয়া কোথাও কোন নৌকার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না। যে ছেলেটি বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে এ ঘটনায় খুব বেশী মনঃক্ষুণ্ণ বা ক্ষুব্ধ না দেখাইলেও অল্প বয়সী সঙ্গীটি বিশেষ একটু হতাশা অনুভব করিয়াছিল, তার মুখভাবেই তাহা সুব্যক্ত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ ক্লান্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "এখন উপায় ?"

"কিসের উপায় ?" অপর ছেলেটি ঔৎসুক্যহীন সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল। সে পকেট হইতে একটা ময়লা আধছেঁড়া রুমাল বাহির করিয়া কপালের ঘাম এবং ঘামে ভেজা ধূলা মুছিতেছিল।

"ওপারে যাওয়া যায় কি করে ? খেয়া-নৌকা সন্ধ্যার পর আর চলে না। আজ তো দেখছি সন্ধ্যার আগেই কাজ চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে !"

অন্য ছেলেটি বলিল, "তাহলে ফেরাই যাক্।"

"কোথায় ?" বলিয়া প্রায়-কিশোর বয়সী,—বেশ একটু সুকুমার চেহারার তরুণ ছেলেটি হতাশা-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে বয়োজ্যেষ্ঠের মুখের পানে চাহিল, "ফিরে এখন আমরা যাবই বা কোথায় ? আর তাছাড়া এখানে এক মুহূর্ত্তও না থাকাই ভাল।"

শেষের দিকের কথা কয়টা সে একটু সঙ্কুচিত ও ছাড়াছাড়া ভাবেই বলিয়া গেল।

সাথী হাসিয়া উঠিল, "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনঃ, নীতি শাস্ত্র তাই বলে, বটে রমেনবাবু ! কিন্তু শাস্ত্রকার এবং অদৃষ্টকার তো আর এক ব্যক্তি ন'ন।"

রমেন একটু নিরুদ্যম ভাবে উত্তর করিল, "না, তা ন'ন, কিন্তু—"

"হ্যাঁ, কিন্তু আছে বৈকি ! বিশেষতঃ আপনার মত অভিজাত ঘরের ছেলের

পক্ষে। তথাপি যখন আজকের রাতে নদী পার হয়ে ট্রেন ধরবার উপায়, তখন কোন মতে রাতটা কোন একটা আস্তানার ভেতর মাথা গুঁজে ত্রো কাটাতেই হবে। তাছাড়া আপনার অবস্থা কি জানি না, আমার তো পেটে যা হয় একটু কিছু না পড়লে আর শরীর বহন করে ঘুরে বেড়াবার মত সামর্থ্য নাই।"

রমেন একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল, ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া সে কহিয়া উঠিল, "তাহলে কোথায় যাওয়া যেতে পারে, চলুন দেখাই যাক!"

পথ চলিতে চলিতে সন্দিগ্ধভাবে ঈষৎ চাহিতে চাহিতে সে বলিল, "কই এদিকে তো কোন জনমানবের বাস আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না!"

তার সঙ্গী উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তার হাসির মধ্যে হইতে একরাশ বিদ্রূপ যেন উদ্গত হইবা ছড়াইয়া পড়িল। ঈষৎ তীক্ষ্ণ স্বরে সে বলিল, "জন এবং মানব বলতে যদি অট্টালিকাবাসীরাই একমাত্র উক্ত পদবাচ্য হন, তাহলে রমেনবাবু আপনার সন্দেহই সত্য;—এদিক ঘেঁষে কোন উচ্চ বর্ণের অথবা উচ্চ শ্রেণীর মানব পুঙ্গব বাস করেন না, করা মর্য্যাদা-হানিকরই ভাবেন। কারণ, ওই ঘন বাঁশবন ও পচা ডোবাগুলোর মধ্য দিয়ে যেসব ভাঙ্গা-চোরা কুঁড়েগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো যে কোন অভিজাত বংশীয়দের মোটেই নয়, তা বলাই বাহুল্য। ওদের অধিবাসী কতকগুলো জেলে এবং ঘর কতক নমঃশূদ্র।"

রমেন কতকটা হতভম্বের মত হইয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গী আবার সেই প্রকার উপহাসমিশ্রিত অট্টহাস্যে সেই নির্জ্জন-প্রায় নীরব বনভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলিল, "কি রমেনবাবু! ঐ সব ছোট-লোকদের মধ্যে যাওয়া বা থাকা আপনার ধাতে সইবে না, না? তাহলে নদী তীরে গিয়ে নদী নীরেই উদর পূর্ণ করে নিন, আমি বরঞ্চ ততক্ষণ একগাল মুড়ি টুড়ির সন্ধান দেখি গিয়ে।"

রমেন চারি পাশে চাইয়া দেখিল, ঘনবিন্যস্ত শাখা পত্রে সমাকীর্ণ গভীর জঙ্গল-পূর্ণ পটভূমিকার মধ্যে একটি খড়ের ছাওয়া কুটির মধ্য হইতে সম্ভবতঃ খড়কুটা

জ্বালার ধূম নির্গত হইতেছে। সেদিক হইতে দু একটি শিশু কণ্ঠেরও আনন্দ কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল। সহসা তার কানে আসিল, সেই কুটীর শ্রেণীর কোন একটির মধ্য হইতে হয়ত কোন গ্রাম-বৃদ্ধের তাল-লয়-বিহীন গ্রাম্য স্বরের এতটুকু একটুখানি একটা গানের দুটো চরণ :—

"তোর পোড়াকাঠের ছায়ের মধ্যি থাকবো না লিখা,
তোর গলায় ছ্যাল মতির মালা রাজার আংরাখা।"

রমেন সহসা উদভাসিত প্রফুল্লমুখে মুখ ফিরাইয়া দীপ্ত চোখে সমভিব্যাহারীর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিল; স্থিরকণ্ঠে অথচ অনুত্তেজিত ধীরতার সহিত উত্তর করিল, "চলুন, চাট্টি মুড়ি গুড় যাহোক একটা মুঠো কিছু না পেলে শুধু নদীর নীরে আমারও আর চলছে না।"

বয়োজ্যেষ্ঠের মুখে একটুখানি স্নিগ্ধ হাসি মুহূর্তের জন্য ফুটিয়া উঠিল। অন্তর্গূঢ় নিহিতার্থ-পূর্ণ সেই হাস্যাভাসটুকু রমেন অবশ্য দেখিতে পাইল না, পাইলে তাহার অর্থ সহজেই হয়ত বুঝিতে পারিত—তাহা জয়ের আনন্দ!

পায়ে-চলা সুঁড়িপথ, তাহাতে বাঁশপাতা রাশি রাশি হাওয়ায় উড়িয়া পড়িয়াছে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদাও পিচ্ছিল করিয়াছে; সেই সঙ্গে সৃষ্টি হইয়াছে একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। বাহিরে এখনও স্বল্পায়ু সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু ঝিক মিক্ করিতেছে। অনিন্দ্যসুন্দর মুখের মৃত্যু-পাণ্ডুরতার মত তাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবর্ণতর হইয়া আসিলেও তাহার জ্যোতি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় নাই। এদিকের এই বাঁশবনের ভিতরের তো কোথাই নাই, এর গায়ে গায়ে অন্ধকারের ছায়া অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। সবুজ পাতাযুক্ত বংশচূড়াগুলা যেন কালো নিশানের মত কাহার বা কাহাদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার জানাইতেছে। বাতাসে বাতাসে বাঁশে বাঁশে ঘষিয়া একটা যেন মর্ম্মর সর্‌সর্ ধ্বনি উঠিতেছে, কখন তীব্রভাবে কখন গুঞ্জন স্বরে।

রমেনের মনের মধ্যে দারুণ একটা অস্বস্তি করিতেছিল। যতই সে অগ্রসর হইতেছিল তাহার মন ততই যেন পিছাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। ভিতর হইতে কে যেন একটা ধাক্কা দিয়া বলিতেছিল, এ তোমার হচ্চে কি! কে একটা কোথা-কার লোক, পথ চলতে চলতে হঠাৎ জেলখানার দরজার কাছে দেখা হয়ে গেল, সে যেচে এসে কথা কইলে, নিজে থেকে হঠাৎ বলে বসলো, "দু বছর পরে জেল থেকে সদ্য এই বার হচ্চি, একটি পয়সা হাতে নেই, অথচ পেটে একপেট ক্ষিদে আছে, সেটা জেলের মধ্যে সম্পূর্ণ রেখে আসতে পারিনি, যাহোক কিছু খেতে দিতে পারেন?"

একটু থেমে ফের বলে, "ষ্টুডেণ্ট বলেই মনে হচ্চে, তাই এই দুঃসাহস! গৃহস্থ বাড়ী আমাদের জায়গা হয় না, সেখানে আমরা দক্ষিণী পারিয়া বা অস্পৃশ্য," বলিতে বলিতে আপ্রান্ত মুখ উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণ কৌতুকের সঙ্গে সরল উচ্চ হাসি হাসে।

রমেন সত্যই একজন নামকরা ভাল কলেজের গৌরবান্বিত কৃতী ছাত্র। সে এখানে আসিয়াছিল একজন ছাত্র বন্ধুর খোঁজে। এখানে তাহাকে সে পায় নাই, নদী পার হইয়া ওপারে গিয়া ট্রেন ধরিবে এবং ভোরের ট্রেনে শেয়ালদায় পৌছিয়া যথা নিয়মিত নিজের কলেজ ক্লাশ করিতে যাইবে, এই ছিল তার প্ল্যান; সেকথা সে ভুলিয়া গেল, এক মুহূর্ত্তে তার মনের পটে অনেক কিছুই ফুটিয়া উঠিল! দেশের জন্য আত্মোৎসর্গকারী বহু ছাত্রের কথা ও কাহিনী যাদের নাম সে জানিত, সকলের স্মৃতি ভিড় করিয়া একত্রে ছুটিয়া আসিল।

হঠাৎ তার মনে হইল, ইনিও তাদের মধ্যেরই একজন কেহ! কে জানে কে ইনি? ঈষৎ বিস্ময় বোধ করিল, কই এঁকে রিসিভ করতে তো একজনও কেউ আসে নাই?

সে শুনিয়াছিল, এদের জেলখালাসের দিনে এদের জন্য জগন্নাথের রথযাত্রা বা

মারোয়াড়ীদের রথযাত্রার অনুকৃতি করা হয়। সেকালে বড় বড় রথীদের জন্ম ছেলেরা শুধু সারথীই হইত না, গাড়ী হইতে ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা তাদের বাহন পর্য্যন্ত হইত! ইদানীং গায়ের জোর কমিয়া গিয়াছে; তাছাড়া মোটরের দৌলতে ভাল ল্যাণ্ডো ফিটন ব্রুহাম-চেরিয়ট মিলে না, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া হইতে কে চায়? আর যে চড়িবে তারও বা এতে ইজ্জত না বাড়িয়া কমিয়া যাইবে যে! সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, একটি জনপ্রাণীও কই এঁর সঙ্গে নাই!

তার এই ইতস্ততঃ ভাব ঢাকা ছিল না, প্রার্থী পুনশ্চ হাসিল, এবার অবশ্য উচ্চ নয়, মৃদু হাস্য; কহিল, "যাক, ভরসা না পান তো দিয়ে কাজ নেই, আমি সে জুটিয়ে নেবোখন,—যান আপনি কোথা যাচ্ছিলেন, যান। অনর্থক আপনাকে খানিকটা ডিটেন করে রাখলুম, মাপ করবেন।"

ফের একটু হাসিল, "রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, কিন্তু মহা-মানবদের সকল কথা সব সময় তো মানা চলে না, আমার তো চলবেই না, এখন দু চার দিন আমাকে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', করেই চালাতে হবে, তা সে যার কাছ থেকেই হোক।"

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, উল্টা পথের দিকে পা বাড়াইল। চলিতে উদ্যত হইয়া ফের বলিল, "মাপ করবেন! যাক্ দুবৎসর পরে বাইরে এসেই একটা মাপ চাইবারও তোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন! ওসব ভদ্র ভাষায় 'এটিকেটের'—আর যা থাক বা না থাক, বলাই ওখানে ছিল না। জানেন, সে একরকম নেহাৎ মন্দ থাকা যায় না, শুধু থেকে থেকে হারানিধিদের খোঁজ রাখতে গিয়ে ঘুমুতে দেয় না, এইটেই বড় কষ্ট!—"

রমেন্দ্রনাথ সচকিত নেত্রে চাইয়া দু' পা অগ্রসর হইয়া আসিল, ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, "যাবেন না, আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে—কথাটা রূঢ়ভাবে নেবেন না,—আহার ও আশ্রয় দেবো।"

সূর্য্যের ঈষৎ স্নিগ্ধালোকে শীর্ণপ্রায় মুখখানাকে নূতন ভাবে সুন্দরতর বোধ হইল।

রমেন কহিল, "এর ভেতর মানুষ থাকে?" কল্পনা করিতে গিয়াই সে সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল।

সাথী হাসিল, সেই রহস্যময় উপহাসের তীব্র হাসি! এবার তার মধ্য হইতে প্রচুরতর রূপে আরও কিছু একটা জিনিস উৎসারিত হইয়া যেন তাদের দুজনকার চারিদিক দিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সে জিনিসটা এত বেশী তীব্র ও তীক্ষ্ণ যে, হাস্যধ্বনিরূপে বিচ্ছুরিত হইতে থাকিলেও তার মধ্যকার বিষাক্ততা চাপা ছিল না। রমেন সে শব্দাঘাতে মুহুর্মুহুঃ শরীরে মনে যেন চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে লাগিল।

"মানুষ! আপনার বা আমার মত যদি দুটো করে হাত-পা আর একটি করে কাঁধের উপর মাথা জড়ো করা থাকলে তাকে মানুষ বলা চলে, তবে ওখানে মানুষই থাকে অন্ততঃ এই পলিত, গলিত, অস্বাস্থ্যকর স্থানের আবহাওয়া আর শেয়াল কুকুরেরও পরিত্যজ্য কদর্য্যাহারের মধ্য দিয়েও যে কদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয়! কেউ কয়েকটা দিনও কাটিয়ে যায়!"

একটু থামিয়া বলিল, "খুব আশ্চর্য্য, না? অথচ কিছু কিছু দিন ওরা অর্দ্ধাহারে অনাহারে কদাহারে ও নানান কষ্টে-দুঃখে আছেও বেঁচে। কেউ কেউ দীর্ঘদিনও বেশ টিকেও যায়।"

যে দেশের দারিদ্র্যের কিছুমাত্র অভাব নাই, রমেন, সেই ভারতবর্ষের—তথা বাংলাদেশেরই ছেলে। সে যে কখনো গরীব দেখে নাই বা বস্তির ধার ঘেঁষিয়া তাকে পথ চলিতে হয় নাই, এমন কখনো হইতে পারে না; তবে এতটা হীনাবস্থদের এতখানি নিকটবর্ত্তী হওয়ার কোন কারণ এ পর্য্যন্ত তার ঘটে নাই। তাই সে এর মধ্যে ঢুকিতে হইবে মনে করিয়া কিছুটাই বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু

পথ খুঁজিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়াই সেই কর্দ্দম-পিচ্ছল সুঁড়িপথে সাবধানে এ্যস্তপদে পথ চলিতে লাগিল।

দুধারের বাঁশঝার তাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জামা-কাপড় টানিয়া ধরিতেছিল, গায়েও বিঁধিতেছিল, কোথাও কোথাও আবার উপর দিক হইতে মাথার উপরেও যথেষ্ট খোঁচা মারিতেছিল, অন্যমনস্ক হওয়ার কিছুমাত্র উপায় নাই। কাজেই পদে পদে সাবধান হইতে গিয়া সে আর জবাব খোঁজার অবসর পাইল না।

হঠাৎ কানে আসিয়া ঠেকিল, সেই দূরের সঙ্গীতের রেশটুকু, এবার সেটা শোনা গেল একেবারেই কানের কাছে :—

"খাট পালং তোর নিয়্যা কেড়্যা,
দিবেক কাঠের শয্যে পেড়্যা,
হাল দোহালার বদলা দিবেক ঐ কাঠ দিয়েই ঢাক্যাং—"

রমেনের সাথী ডাকিয়া উঠিল, "জীবনদা।"

গান হঠাৎ থামিয়া গেল। রমেনের মনে হইল, হঠাৎ বাজিয়া-ওঠা একখানা ভাঙ্গা কাঁশির বাদ্য যেন এক মুহূর্ত্তে থামিয়া পড়িল।

একটা অনতি-উচ্চ আনন্দধ্বনি তাদের ঠিক পাশের দিকটার একটা প্রয়োন্ধকার ঝুপড়ীর মধ্য হইতে শ্রুত হইল।

অ্যা—নরেনদার রা পাইছি ছেন্যে। জেহাল সে উবার ঐলো না কি?"

নরেন প্রীতি-বিকশিত মুখে উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐলামতো! পেটে এখন বড্ডই জ্বালা। মুড়ি-চালভাজা যা হয় দু'মুঠো বার কর দেখি শিগগির।"

"এসো দাদা, এসো, এসো, এই যে দিচ্ছি। কাদি! কাদি! ঝট্ কইর‍্যা আয়, ছাথ্ সে কেডা আলো!"

বাঁশবনের মাথার উপরে কোন রকমে যদি চোখ তুলিয়া সেই প্রায় অভেদ্য শাখাজাল পথে চাওয়া যায়, অস্তমিত সূর্য্যের অবশেষ ক্ষীণ আভা এখনও সেখানে ফিকে লাল এবং উজ্জ্বল গোলাপী রংয়ে নীলের অঙ্গে ক্ষীণ শোভা বিস্তার করিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর গায়ে এখনও একটা অতি স্নিগ্ধ আলোর ওড়না জ্যোৎস্নালোকেরই কাছাকাছি রূপ ধরিয়া তাহাকে ঈষদুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উদর-গহ্বরের মতই এই আরণ্যক স্থানটিতে সে আলোর ছটা তো বহুক্ষণ হইতেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোর আভাষটুকুও একান্তই ক্ষীন। তথাপি কিছুক্ষণ অন্ধকারারে চোখ মেলিয়া থাকিতে থাকিতে মানুষের চোখে অন্ধকারটাও ক্রমে ক্রমে সহিয়া যায় এবং তারই মধ্য দিয়া একটা অস্পষ্ট আবছা গোছের দৃশ্যপট ফুটিয়া ওঠে।

রমেন হতচকিত হইয়া কিছুক্ষণ তার সাথী (এখন জানা গেল তার নাম নরেন, খুব সম্ভব নরেন্দ্রনাথ বা নরেন্দ্রকুমার এমনিই কিছু হইবে, তার নিজের নামের সঙ্গে অতি আশ্চর্য্যরূপেই মিল!) এবং ওই হুমড়ী খাওয়া গোলপাতার আধ-ছাওয়া গৃহের ভাঙ্গা বেড়ার আশ্রয়স্থলকে যদি ওই নামে অভিহিত করা চলে তবে বলা যায় এ গৃহপতির শুভ সম্মিলনের পারস্পরিক আনন্দ প্রকাশ ও কুশল বার্ত্তার টুকরো টুকরো কথাবার্ত্তা মাত্র শুনিতে শুনিতে অল্পে অল্পে তার চোখের সামনে ফুটিয়া-ওঠা দৃশ্যপটখানির প্রতি বস্তুটি সে দেখিতে পাইল। অপরিচ্ছন্ন এক টুকরা দাওয়ার মত জায়গা—প্রৌঢ় বয়স্ক একজন মিশকালো রংয়ের জীর্ণশীর্ণ লম্বাটে লোক বোধকরি ঐখানে বসিয়া তামাক টানিতেছিল (যেহেতু কড়া তাম্রকূটের একটা তীব্র কটু গন্ধ হাওয়ায় ভাসিতেছিল, পাতা পচা গন্ধকে সম্পূর্ণ না হোক অন্তত অংশত ঢাকিতে সে অক্ষম হয় নাই।)।

নরেনের দৃঢ়বদ্ধ আলিঙ্গনে যে লোকটি এক্ষণে আবদ্ধ হইয়া আছে এবং দুজনে অনর্গল কথা কহিয়া চলিয়াছে। কি কথা, তা সে ভাল শুনিতে পাইতেছিল না,

যেহেতু বক্তাদের মুখ এবং কান একান্ত ভাবেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া রহিয়াছে। তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু অশুভ সংবাদ থাকাই সম্ভব। জীবনদার গলায় যে অশ্রুজলের ঢেউ আসিয়া তটপ্রান্তে ছলছল করিতেছিল, বার বার ধাক্কা দিয়া উছলাইয়া তুলিতেছিল, তা বেশ জানাই যায়।

কয়েকটা মিনিট, খুব বেশী সময় নয়, তাহা কাটিয়া যাইতেই নরেন্দ্র আপনাকে তার বন্ধুর আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া লইল, একেবারেই সেই সহজ সানন্দ কণ্ঠেই কথা কহিয়া উঠিল, "উঃ জীবনদা! করছো কি? পেটের নাড়িগুলিন যে চুঁয়ে পুড়ে একশা হয়ে গেল! তোমার ঐ পোড়া কাঠের ছাইয়ের মধ্যে মিশে যেতে আর দেখছি বেশীক্ষণ বাকি নেই! দাও, দাও শিগ্‌গির বার করো কোথায় কি আছে!—পান্তা ভাত নেই?"

রমেন আর একবার শরীর ও মনে শিহরিয়া উঠিল। পান্তা ভাত? এই পচা দুর্গন্ধযুক্ত বিষবাষ্পভরা জঙ্গলের মানুষটাব এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় বসিয়া তাদেরই পচা নোংরা হাঁড়ির বাসি ভাত?

কি সর্ব্বনাশ! অসম্ভব, সে যদি ক্ষুধায় মরিয়াও যায়,—না, পারিবে না! এ কার পাল্লায় সে পড়িয়াছে? লোকটা পিশাচসিদ্ধ-টিদ্ধ নাকি? শোনা যায় মানুষ বা পশুর মাংস পর্য্যন্ত খায়, একি তাহাদেরই কেহ?—

তাহলে এ জেলে ছিল কি জন্য? কি জন্যে ছিল তাই বা কে জানে? সত্যাগ্রহী বা বিপ্লবী, হয়ত এ সবের কিছুই এ নয়!

জীবনদা ইতিপূর্ব্বে যে সব কথা কহিতেছিল তার সঙ্গে বোধ হয় শোকাশ্রু-মোচনও করিতেছিল। যেহেতু সে যখন ব্যস্ত হইয়া কথা কহিল, তার মধ্যে তখনও একটা জলে ভেজা আর্দ্রতার রেশ সুস্পষ্ট ছিল।

"এই যে দাদা, দিচ্ছি, দিচ্ছি, ওরে হাদি! তোর হান গেল হনে? হানের মাথা কি খাইচিস্?"

একটুখানি দূর হইতে অর্থাৎ যে দিকটা হইতে ধোঁয়া উঠিতে দেখা গিয়াছিল, ভিতরে ঢুকিয়া অন্ধকারের জন্য সেদিকে এতক্ষণ কি আছে তাহা দেখা যায় নাই, এখন সেই দিক হইতে জীবনের কর্কশ সম্ভাষণ ধ্বনির একটা ততোধিক কঠোর প্রতিধ্বনি ভাসিয়া আসিল—

"কাণ্ডের মাতা খাইনাইগ, চক্ষ্যের মাতা তুমিই খাইচ, কথন থে তো দৈইড়ে আইচি, স্যাক্‌চ নি!"

"হেঁ হেঁ, হেঁ, হেঁ, তাই হও! তবে শুনচো ও নরিনদা কি কলেন? ওঁনারে কি খাতি দিবি দে, আছে কিছু?"

"তাই কওনা ক্যানে, দাদা আইচেন! কবে আলেন? জেহাল হতি ছাড়ান পালেন কয়ডি দিন? হ্যাঁ দাদা! আপনি তো হোতাখে আসচ্যান, হোতাকে আমার নন্দুরে ঢ্যাকি আলেন? নন্দু অ্যাখন কেমন ডি হইচেন? খুব পাঙ্গাশ পারা হয়ে গেছেন নাকি? কাঠিপারা সলতেপরা দশাটি হইছে নাকি?"

জীবন চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমর পোড়ামাগী! হোতায় ভদ্দর লোকের ছাবাল খাতি চাইলো, ভুকে চকে দেখতে না পারার দাকিল, আর ওনার সব কিচ্ছু নন্দুর কেচ্ছা ধুকড়ি ঝেড়ে বাইর ঐলো! আগে তো ওরে খাতি দিবি দুটো, না, না?"

নরেন বাধা দিল, "তুমি থামো না ভাই জীবনদা! না ভাই কাদু বৌদি, নদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, সেও আমার জেলখানায় ছিল না, সেই জন্যে আমি তার খবর তোমায় দিতে পারলাম না। আচ্ছা আমি এখনো তো বাইরে এলুম, দেখবো, খুব চেষ্টা করে দেখবো যদি তার খবর যোগাড় করতে পারি নিশ্চয়ই তোমাকে এসে জানিয়ে যাবো, তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।"

ঈষৎ কি ভাবিয়া লইয়া কহিল, "আর তাছাড়া সে কাঠিপারা লাঠিপারা যে হয়নি সে আমি তোমায় জোর গলায় বলে দিচ্চি, বরং গাঁট্টাগোঁট্টা একটু হলেও

হতে পেরেছে। আমরা যেখানে ছিলুম ওসব খানে আর যাহোক, তোমাদের এইসব পচা গন্ধ-বাষ্প থাকে না—"

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পুত্র-বিচ্ছেদ-ব্যাকুলা দুঃখিনী মা ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল,."হ্যাঁগ, দাদা! ওখানে প্যাটভরা চাড্ডে চাড্ডে ভাত খাত্তি পায়তো? তুভি ব্যালা দ্যায়? নন্দু আমার বলতি নাই, চাড্ডি ভাত বেশী কর‍্যা খাতি চায় কি না!"

ঈষৎ-রোদন-রুদ্ধ কণ্ঠে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া পুনশ্চ বলিল, "বাছারে ওই দু মুঠো ভাত দিতি কতই অকথা কুকথ্যাই না কইচি! কাচ্ছা বাচ্চাদেরকে উপুস রাখতি তো আর পারা যায়নে। কইচ্যি, তোর ফাঁড় প্যাটেই সমস্ত ঢ্যালে দোব নাকিরে! অমুন পোড়া প্যাটে তু আগুন জ্যালে দে। গোঁস্সা কইরে ছাবাল আমার না খ্যায়ে উঠে গেচে। কতডি দিন গ্যাচে!"—

শেষ দিকের সমস্ত কথাগুলি অস্পষ্ট হইতে হইতে অস্ফুট হইয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্যেই দেখা গেল সেই শীর্ণ ও দীর্ঘ দেহধারিণী নারী তার কোন মতে দেহ-আচ্ছাদনকারী অতি মলিন ছিন্ন বস্ত্রের প্রান্তটুকু কষ্টে টানাটানি করিয়া চক্ষের সমীপে লইয়া আসিতে চাহিতেছে, চোখের জল মুছিবার জন্য ছাড়া আর কিসেরই বা জন্য!

জীবনের গলা শোনা গেল, ধরা গলায় সে এবার একটু কোমল করিয়াই স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিল, বলিল,—

"কাঁদি কাঁদি তো চখখু অন্ধ করলি ফল পালি কিছু তা'তে? যা ল্যাখন নিয়ে আইচিস্ সে তো অইবেই, সেও না হবার লয়, হা-ভাতের ঘরে যখন জন্ম লইছ্যান, তখন উতো অতেই অবে। এই যে তো চন্দু, নালু, রাসিদাসী, উদেরকে কি প্যাটপুরা খাওন দিতি পারচুস্? থামা দে, যা বা হয়, মুড়ি থাকে তো দুটো অ্যান্যেদে, গুড় টুক্‌চে থাহে—"

"আচ্যে গ' আচ্যে, আমি আনি দিচ্চি, আবার যেন কেড়ারে দেকি না ?" হ্যাঁ দাদা! সাতে আটি কে' বটেক গা ?"

এতক্ষণ হৃতবাক হৃতশক্তি অভিনব পরিবেশের অভূতপূর্ব্ব পরিচয়ে হতভম্ব রমেন্দ্রের বিস্মৃতপ্রায় অস্তিত্ব সম্বন্ধে নরেন্দ্র যেন সহসাই সচেতন হইয়া উঠিল, অপ্রতিভ হাস্যে তার গায়ে সাদরে হাত দিয়া যেন তাহার কাছে নীরব ক্ষমাভিক্ষা করিয়া লইয়া উত্তর করিল—

"ও দিদি ভাই! বলতে ভুলেছি, আমার একটি ভাইকে রাস্তায় কুড়িয়ে পেলুম, তোমার দোরে আজ জোড়া অতিথ। তবে বেশী আমরা খাবো না, তুমি একজনার মতনই দাও, দোনো ভাই তাই আমরা নিয়ে ভাগ করে খাবো।"

কাহু নিরুত্তরে যেদিক দিয়া আসিয়াছিল, সেই দিক দিয়াই ফিরিয়া গেল। জীবন ইতিমধ্যে তার ঝুপড়ীতে ঢুকিয়া চকমকি পাথর ঠুকিয়া ঠুকিয়া একটি কেরোসিন ঢিবরী জালিয়াছে, সেটি দোরগোড়ায় রাখিয়া ভিতর হইতে খেজুর পাতার একখানি ছেঁড়া চ্যাটাই বাহিরে আনিয়া এদের বসিবার জন্য পাতিয়া দিল। তিনটে উলঙ্গ ছেলে এবং একটা ছেঁড়া ময়লা গামছার টুকরো পরা ছোট মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্মিত-বিস্মিত দৃষ্টিতে আগন্তুকদের দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এতক্ষণ হয়ত অপরিচিত গলার সাড়াশব্দ পাইয়া তাহারা ভয় পাওয়া জানোয়ারের মতই শঙ্কিত বিস্ময়ে নিঃসাড় হইয়া ঘরের মধ্যে পড়িয়াছিল।

নরেন ডাকিল, "চন্দু! বাসি। দামিনী! কিরে কাকাকে ভুলে গেছিস? আয় হ্যানে আয়, তুই যে বড় এলিনি, বড় মানষের বেটি ? রাগ হয়েছে ? নে এই কোলটায় দামী বোস, এইটায় চন্দু, বাসুমা, তুই বড় হয়েছিস কিনা, তুই আমার গলা ধরে পিঠে ঝোল, কেমন মাম্নি ?"

সেই প্রায়ান্ধকারের বিচিত্র বিচিত্র আলোছায়ার মধ্য দিয়া চারিপাশের অদৃষ্ট-